গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১১ - ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

জনকল্যাণে টাকা নেই বিপুল কর ছাড় মালিকদের

'সরকারের টাকা নেই, এত টাকা সরকার কোথায় পাবে' — কথাটা আজকাল প্রায় রোজই শোনা যায়। প্রশাসন চালানো, আমলা-মন্ত্রী-সাংসদদের নতুন গাড়ি, বিদেশভ্রমণ, ঢালাও বিলাসব্যসন কিংবা প্রতিরক্ষা খরচ বাড়াতে অবশ্য অভাবের কথা ওঠে না। কিন্তু খাদ্য, সার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা জনস্বার্থে খরচের কথা উঠলেই সরকার বলে 'টাকা নেই'। বছর কুড়ি আগেও কথাগুলো এভাবে উঠতো না। প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও এসব খাতে কিছু খরচ সরকার করতো। হঠাৎ, বিশেষ করে '৯১ সালে নয়া আর্থিক নীতি চালু করার পর সরকারের এত অভাব দেখা দিল কেন? নয়া আর্থিক নীতিতে বলে দেওয়া হয়েছে — প্রথমত, ভর্তুকি সরকার দেবে না, এটাই নতুন নীতি; সবই বাজার দরে কিনতে হবে; শিক্ষা, স্বাস্থ্যও তাই। দ্বিতীয়ত, 'শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে' বৃহৎ শিল্পের উপর কর ছাড় দিতে হবে।

এর আগে গণদাবীর নানা লেখায় আমরা দেখিয়েছি, সরকারের 'টাকা নেই' — এটা অজুহাত; আসলে সরকারের আয় কমে যাবে জেনেও সরকার ক্রমাগত মালিকশ্রেণীকে ঢালাওভাবে কর ছাড় দিয়েছে। ফলে সরকারের আয় কমে গিয়েছে। অথচ তার মধ্যেই মাথাভারী প্রশাসন, মন্ত্রী-আমলাদের বিলাসব্যসন, বিপুল সামরিক ব্যয় কিছুই তারা কমাচ্ছে তো না-ই, উল্টে বাড়াচ্ছে। কাজেই সরকারি তহবিলের ওপর চাপ বাড়ছে। ফলে জনস্বার্থমূলক কাজে সরকার খরচ কমাচ্ছে। এজন্য অজুহাত দেখাতে সরকার এবং সংবাদপত্র যখনই বলছে — 'সরকারের টাকা নেই' এবং আমরা বলছি সরকার মালিকদের ঢালাও ছাড় দিচ্ছে, তখন অনেকেই প্রশ্ন করছেন — কত টাকা সরকার ছাড় দিচ্ছে? যে টাকা ছাড় দিচ্ছে তার পরিমাণ কি এতটাই যে তা দিয়ে সত্যিই জনস্বার্থে কাজ করা যেত?

উত্তরটা সরাসরি সরকারি বিবৃতি থেকে পাওয়া না গেলেও সরকার প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে কষে বের করে নেওয়া কঠিন নয়। সরকার সর্বদাই ছাড়ের হিসাবটা শতাংশে বলে, যা থেকে মোট ছাড়ের হিসাবটা সহজে ধরা যায় না। বার্ষিক আর্থিক সমীক্ষা বা বাজেট বক্তৃতাতেও জনগণের বোঝার মতো করে স্পষ্ট হিসাবটা সরকার দেয় না। উল্টে শতাংশের হিসাবে ছাড় ঘোষণা করার সময় সরকার জোর গলায় প্রায়শই বলে, কর ছাড় দিলেও মোট আয় সরকারের কমবে না। এক্ষেত্রেও তারা প্রতারণা করে। কারণ, দেশে উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সরকারের আয় বৃদ্ধি না হলে ক্রমবর্ধমান সরকারি ব্যয়বৃদ্ধি ও টাকার মূল্যহ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে টাকার অঙ্কে সরকারের মোট আয় না কমলেও প্রকৃত আয় কমে যায়।

কর ছাড়ে লাভবান হয় মালিকশ্রেণী

দেশের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) সঙ্গে সরকারের কর ও শুল্কের শতকরা হার থেকে কর ছাড়ের একটা নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া যায়। জিডিপির হিসাবের নানা জটিলতা ও কারচুপির দিকগুলি বাদ দিয়ে সহজ ও মোটা কথায় বলা যায় — কৃষি, শিল্প, পরিষেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেশের মোট উৎপাদনের অর্থমূল্য, ঋণবাবদ 'আয়' ইত্যাদির মোট পরিমাণ হল জিডিপি। কাজেই জিডিপি বাড়লে, শতাংশের হিসাবে করের হার না বাড়ালেও সরকারের মোট আয় বাড়ার কথা। কিন্তু

আটের পাতায় দেখুন

নেপাল
কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

নেপালে জরুরি অবস্থা জারি করে স্বৈরাচারী রাজা কর্তৃক ক্ষমতা দখল করার ঘটনায় তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী গত ৪ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, নেপালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সে দেশের জনগণের ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী আন্দোলনের উপর এটা এক নির্লজ্জ আক্রমণ। নেপালের সংগ্রামী জনগণের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে কমরেড মুখার্জী, স্বৈরাচারী রাজার সঙ্গে যোগসাজশে ভারত সরকার এতদিন পর্যন্ত নেপালী জনগণের এই ন্যায়সঙ্গত লড়াইকে যেভাবে বিরোধিতা করে এসেছে তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। সংগ্রামী নেপালী জনগণের প্রতি বন্ধুত্বকামী ভারতীয় জনগণকে এই গণতন্ত্র হত্যার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। সিপিআই(এম) এবং সিপিআই-এর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন যে, তাদের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ভারত সরকারের ওপর প্রভাব খাটিয়ে এই ধরনের গণতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে এবং নেপালের রাজতন্ত্রী শাসকের সঙ্গে সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে তারা যেন চাপসৃষ্টি করে।

ভিতরের পাতায়

- মানবাধিকার ও নারীর নিরাপত্তা
- জর্জ বুশের অভিষেক
- বাংলাদেশের সংবাদ
- রিক্সা-ভ্যান-ঠেলা চালকদের আন্দোলন প্রসঙ্গে
- বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে অ্যাবেকার প্রতিবাদ পত্র
- দুষ্কৃতীদের আক্রমণে ইউ টি ইউ সি-এল এস সংগঠক গুরুতর আহত

গণদাবীর গ্রাহক হোন

বার্ষিক ঃ ৭৮ টাকা / ৯১ টাকা (সডাক)

ষান্মাষিক ঃ ৩৯ টাকা / ৪৬ টাকা (সডাক)

সডাক গ্রাহকদের প্রতি অনুরোধ তাঁরা যেন শীঘ্র বকেয়া পরিশোধ ও নবীকরণ করে পত্রিকা প্রকাশনে সহযোগিতা করেন

ইরাকে নির্বাচনের নামে প্রহসন

গত ৩০ জানুয়ারি ইরাকের নির্বাচনকে 'গণতন্ত্রের জয়' বলে ঢাক পেটাচ্ছে মার্কিন প্রশাসন ও আমেরিকার সংবাদমাধ্যম। কিন্তু ওই নির্বাচনের দ্বারা ইরাকের বাস্তব অবস্থার কোনও পরিবর্তনই ঘটছে না। ভোটের পরদিন ৩১ জানুয়ারি, ইরাকের জনগণ ভোরে ঘুম ভেঙে দেখল, তাদের দেশকে আগের মতই ১ লক্ষ ৫০ হাজার মার্কিন সেনা দখল করে রেখেছে, সিআইএ-র মনোনীত আলাদ আলাই-ই রাষ্ট্রপ্রধান পদে রয়েছে, ইরাকে ১৪টি সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলার পেন্টাগনের পরিকল্পনাও পূর্ববৎ চলছে।

গণতন্ত্র মানে 'জনগণের শাসন'। ৩০ জানুয়ারি নির্বাচনের নামে সেখানে যা ঘটল, তাতে সামরিকভাবে দখল করা দেশে একটি মনোনীত সরকারের শাসনই বহাল থাকল।

একটা অর্থহীন নির্বাচন

রাজনৈতিক নাটকের যে নমুনা ইরাকে দেখানো হল, তাকে নির্বাচন বলাটাই অবাস্তব। একটা নির্বাচনে ভোটারদের নিজেদের পছন্দের প্রার্থীদের বেছে নিতে হয়, সেই নির্বাচিত প্রার্থীরাই পরে বিভিন্ন পদে বসেন এবং কিছু না কিছু ক্ষমতার অধিকারী হয়ে, সেই ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটান। কিন্তু ইরাকের এই নির্বাচনে কোনও প্রার্থীকে, অথবা এমনকী কোনও রাজনৈতিক দলকে বেছে নেওয়ার সুযোগ ভোটারদের ছিল না। পরিবর্তে তাদের হাতে একটি তালিকা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল — যার মধ্যে বহু ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল থাকতে পারে, কিন্তু তারা কে বা কারা, সেটা জানার কোন উপায় ছিল না। মার্কিন জেনারেল পল ব্রেমার 'হাইকমিশন ফর ইলেকশনস্' নামে যাদের নিয়োগ করেছিলেন তারাই এই তালিকা তৈরি করেছিল। ৭৭০০ জন প্রার্থীর নাম অর্থাৎ তারা কে বা কারা তা জনগণের গোচরে আনা হয়নি। ফলে বাস্তবে কোন্ ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া হচ্ছে তা জানার উপায় ছিলনা।

এই প্রক্রিয়ায় কালক্রমে যেসব প্রার্থীরা 'সিলেকটেড' হয়ে আসবেন, তাদেরও শাসন পরিচালনার, অথবা আইন রচনার কোনও ক্ষমতাই থাকবে না। এরা একটা অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় পরিষদ গঠন করবে, এবং দখলদারদের তত্ত্বাবধানে একটা সংবিধান তৈরি করবে।

দখলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার সুযোগ ইরাকের জনগণকে দেওয়া হয়নি। মার্কিন অনুমোদিত প্রার্থীদের নামহীন তালিকায় ছাপ দেওয়ার সুযোগই কেবল দেওয়া হয়েছিল, যারা নির্বাচিত হলেও, তাদের এমন ক্ষমতা নেই যে, তারা ইরাককে উপনিবেশ করার মার্কিন পরিকল্পনাকে পাল্টে দিতে পারে।

ইরাকের জনগণ অবশ্যই স্বাধীন ও প্রকাশ্য নির্বাচনে ভোট দিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই নির্ধারণ করতে চায়, কিন্তু ব্যালট পেপারে কোথাও 'দখল' সম্পর্কে কোনও মতামত দেওয়ার অবকাশ রাখা হয়নি। ফলে এই নির্বাচন প্রহসন ছাড়া কী হতে পারে? মার্কিন সেনার হাতে নিহত লক্ষাধিক ইরাকি ভোট দিতে পারলে, তাদের মতামত কী হত ? তাছাড়া আবু ঘ্রাইবের মত বন্দীশালায় চরম অত্যাচারিত হচ্ছে যে ইরাকিরা তাদের ভোটদানের সুযোগ দেওয়া হলে কী রায় হত?

১৯৫৫ সালে প্রত্যাবর্তন ?

বুশ প্রশাসন দাবি করছে যে, গত পঞ্চাশ বছরে ইরাকে এটাই প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন। ৫০ বছর আগে '৫৫ সালে শেষ গণতান্ত্রিক নির্বাচন বলতে যেটার কথা বলা হচ্ছে, সেটা ছিল মার্কিন ও ব্রিটিশ মনোনীত রাজতন্ত্রের অধীনে একটা উপদেষ্টামণ্ডলী তৈরি করার জন্য নির্বাচন, যাদের হাতে শাসন পরিচালনার অথবা আইন রচনার কোনও ক্ষমতাই ছিল না — যার একমাত্র কাজ ছিল পুতুল শাসকদের উপর একটা বৈধতার ছাপ্পা লাগিয়ে দেওয়া। বাস্তবে ইরাকের জনগণ আগেও যেমন মার্কিন ও ব্রিটিশ তেল কোম্পানিগুলির অধীনে ছিল, ঐ ভোটের পরেও সেটাই থেকে যায়।

এর ঠিক তিন বছর পরে '৫৮ সালে এক বিশাল গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজতান্ত্রিক শাসনের উচ্ছেদ ঘটে যায়। তারপর থেকেই মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আবার ইরাককে পুরনো একই নয়া ঔপনিবেশিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছে। সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ হচ্ছে এই নির্বাচন।

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে অ্যাবেকার প্রতিবাদ পত্র

২০০৫-০৬ সালের বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির জন্য সিইএসসি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে যে আবেদনপত্র জমা দিয়েছে তা বাতিল করার আর্জি জানিয়ে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবাদপত্রে বলা হয়েছে, সিইএসসি ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ উভয় সংস্থাই বর্তমানে লাভজনক সংস্থা, ফলে মাশুলবৃদ্ধির প্রস্তাব সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

সিইএসসি যে গড় মাশুল কমিয়েছে বলে দাবি করেছে তা মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নয়। নিজেই ২.৮% মাশুল বৃদ্ধির আবেদন করেছে, আবার গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করার জন্য বলেছে গড় মাশুল কমানো হচ্ছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে প্রকৃতপক্ষে মাশুল বৃদ্ধি ঘটতে চলেছে ৭০৪ কোটি টাকা, কিন্তু চালাকি করে দেখানো হয়েছে ১৫৭.৭৩ কোটি টাকা।

উভয় সংস্থাই তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপনীতিকে কার্যকর করার কথা বলেছে, যার ফল হিসাবে গরিব গৃহস্থ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষিতে ব্যাপকহারে মাশুলবৃদ্ধি ঘটবে।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও সিইএসসি কর্তৃপক্ষ পরিষেবার উন্নতি, বিদ্যুৎ চুরি বন্ধে তাদের বিরাট সাফল্যের কথা বলেছে, কিন্তু বণ্টন ও সঞ্চালনে ক্ষতির পরিমাণ কোনমতেই কমিশন নির্ধারিত ২২.৫%, ১৪% মানতে রাজি নয় তারা। তাদেরই বক্তব্য, বিদ্যুৎ চুরিই হল বণ্টন-সঞ্চালনের ক্ষতির প্রধান কারণ। এ্যাবেকা মনে করে, বণ্টন-সঞ্চালনে ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে ২০% এবং ১০% এর বেশি হতে পারে না। এছাড়া উভয় সংস্থায় শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা কমান হয়েছে। ফলে খরচকমেছে, অথচ খরচ বেড়েছে বলে দেখিয়েছে। বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ কমানো হয়েছে বলার সাথে সাথে বিদ্যুৎ ক্রয়ে প্রকৃত খরচ থেকে বেশি খরচ দেখানো হয়েছে।

অ্যাবেকার আবেদনে অবিলম্বে সিইএসসি'র অবৈজ্ঞানিক স্ল্যাব প্রথা পরিবর্তনের দাবি করা হয়েছে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে, একই রাজ্যে দু'রকম স্ল্যাব সিস্টেম চালু থাকে কী করে? ভারতবর্ষের চারটি রাজ্যে যখন কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য রাজ্যে ৫০ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে এস টি ডব্লু ও সাবমারসেবল গ্রাহকদের বিদ্যুতের দাম ৩০১০ টাকা এবং ৪১৩৮ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে অ্যাবেকা।

অ্যাবেকা মনে করে, বণ্টন ও সঞ্চালনের ক্ষতির পরিমাণ কমালে, পি এল এফ ৮৬% ধরা হলে এবং অন্যান্য হিসাবের কারচুপি কমালে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের মাশুল কমতে বাধ্য। অ্যাবেকা কমিশনকে সতর্ক করে বলেছে যে, গ্রাহকদের শুনানিতে অংশ নেওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে প্রতি বছরের মতো মাশুলবৃদ্ধি ঘটালে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে প্রবল বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হবে। গ্রাহকরা কমিশনকে ছেড়ে কথা বলবে না।

ত্রিপুরা

রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি পেশ করল এ আই ডি এস ও

গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন রাজ্যের মতো ত্রিপুরা রাজ্যেও ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও ছাত্রদের নানা দাবি দাওয়া নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আসছে।

সম্প্রতি এ আই ডি এস ও'র ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের সর্বভারতীয় চার দফা দাবির সমর্থনে হাজার হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। দাবিগুলি হল ঃ (১) পেশাগত কলেজগুলির সমস্ত আসন মেধার ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে ; (২) সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে ফি নির্ধারণ করার জন্য অধ্যাদেশ জারি করে লোকসভায় আইন পাশ করতে হবে ; (৩) কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করতে হবে ; (৪) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির বেসরকারীকরণ এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধ করতে হবে।

গত ২৮ জানুয়ারি সংগৃহীত স্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারকলিপি সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যপাল মারফত প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করা হয়। বেলা ১২টা নাগাদ ছাত্রছাত্রীদের সুসজ্জিত এবং বিশাল এক দৃপ্ত মিছিল আগরতলার শিশু উদ্যান থেকে যাত্রা শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে রাজভবনের সামনে পৌঁছায়। সেখান থেকে রাজ্য সভাপতি সঞ্জয় চৌধুরী, রাজ্য সম্পাদক বাবুল বণিক, শেফালী চৌধুরী ও মিহির দেবনাথকে নিয়ে এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের অফিসে তাঁর সচিবের কাছে স্মারকলিপিটি জমা দেন। সার্কিট হাউস চৌমুহনীতে ছাত্র জমায়েতে স্মারকলিপিতে উল্লেখিত দাবিগুলি সহ, নোডাল ব্যবস্থা ও ফি-বৃদ্ধি বাতিল, সরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন এবং স্কুলগুলিতে পাঠ্যপুস্তক অবিলম্বে সরবরাহের দাবিতে শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ সঞ্জয় চৌধুরী, ভবতোষ দে ও মিঠু দেবনাথ।

পুরুলিয়া

সিপিএম মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের আক্রমণে ইউ টি ইউ সি-এল এস সংগঠক গুরুতর আহত

পুরুলিয়া জেলায় ভোজুডির কোল ওয়াশারির শ্রমিকদের সংগঠন ইউ টি ইউ সি (এল এস) অনুমোদিত হিন্দুস্থান স্টিল কোল ওয়াশারিজ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড বিকাশ চক্রবর্তী ৩ জানুয়ারি প্ল্যান্ট থেকে ভোর ৪টায় বাড়ি ফেরার সময় সিপিএম মদতপুষ্ট একদল সমাজবিরোধী দ্বারা আক্রান্ত হন। পেছন থেকে লোহার রড দিয়ে তাঁর মাথায়, ঘাড়ে আঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় কমরেড চক্রবর্তী অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে মৃত ভেবে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। কমরেড চক্রবর্তীকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে ধানবাদ মেইন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সংকটজনক অবস্থায় এখনো তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।

৬০-এর দশকে ইউ টি ইউ সি (এল এস) অনুমোদিত এই ইউনিয়নটি গড়ে ওঠার পর ইউনিয়নের সংগ্রামী ভূমিকায় আকৃষ্ট হয়ে অন্যান্য ইউনিয়নের সদস্য শ্রমিকরা এই ইউনিয়নের সদস্য হতে থাকেন। ইউ টি ইউ সি (এল এস)-এর আপসহীন সংগ্রামী ভূমিকায় আতঙ্কিত কারখানা কর্তৃপক্ষ তৎকালীন সরকারি দল কংগ্রেস ও পরবর্তীকালে সিপিএম মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীদের দিয়ে এই ইউনিয়নটি ভাঙার জন্য নেতা ও সংগঠকদের উপর বার বার আক্রমণ করেছে। ১৯৮৮ সালে ইউ টি ইউ সি (এল এস)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য ও উক্ত ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতা কমরেড জে এন সিং-কে আক্রমণ করে গুরুতরভাবে আহত করেছিল। মালিকপক্ষ ও দালাল ইউনিয়নগুলির বারবার আক্রমণ সত্ত্বেও শ্রমিকরা তাদের প্রিয় ইউনিয়নকে দৃঢ় সংগ্রামী মন নিয়ে রক্ষা করে চলেছে।

কমরেড বিকাশ চক্রবর্তীর আক্রমণকারী দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ৭ জানুয়ারি ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড ডি কে মুখার্জীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ওসি'র কাছে ডেপুটেশন দেন। ১১ জানুয়ারি প্ল্যান্টের গেটে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ ডি কে মুখার্জী, এস এস ঠাকুর, শশাঙ্ক মাজী ও কেনারাম মাজী।

বিড়ি শ্রমিক সংঘের আড়ষা থানা সম্মেলন

বিড়ি শ্রমিকদের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে ২৬ ডিসেম্বর পুরুলিয়ার আড়ষা থানা বিড়ি শ্রমিকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আড়ষা হাটতলা প্রাঙ্গণে। পাঁচ শতাধিক বিড়ি শ্রমিক মিছিল করে পৌঁছালে উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য সমাবেশের কাজ শুরু হয়। সমস্ত বিড়ি শ্রমিকদের পরিচয়পত্র প্রদান, চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিড়ি শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার সরকারি দায়িত্ব, মজুরি বৃদ্ধি, সমস্ত বিড়ি শ্রমিকদের পি এফ চালু ও অন্যান্য দাবির ওপর বক্তব্য রাখেন প্রধান বক্তা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য কমিটির সহ-সম্পাদক ও পুরুলিয়া জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড ডি কে মুখার্জী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর পুরুলিয়া জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক কমরেড এস এস ঠাকুর ও পুরুলিয়া জেলা বিড়ি শ্রমিক সংঘের আহ্বায়ক কমরেড রঙ্গলাল কুমার। আগামী ৫-৬ ফেব্রুয়ারি জেলা সম্মেলন ও ১২-১৩ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদে রাজ্য সম্মেলন সফল করার জন্য বক্তারা সমস্ত বিড়ি শ্রমিকদের আহ্বান জানান।

প্রতিনিধি সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কমরেড স্বপন কুমারকে সভাপতি ও কমরেড অনাদি কুমারকে সম্পাদক করে ৪২ জনের একটি শক্তিশালী আড়ষা থানা কমিটি গঠিত হয়।

মুর্শিদাবাদে স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির অবস্থান

সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির আহ্বানে ১২ জানুয়ারি বহরমপুর পুরাতন কালেকটরেটের সামনে বেলা ১১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত এক গণঅবস্থান অনুষ্ঠিত হয়। দুই শতাধিক সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এখান থেকে এক প্রতিনিধিদল জেলাশাসক ও জেলা সভাধিপতির কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। তাতে দাবি করা হয় — কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ভ্রান্ত নীতির জন্য ব্যর্থতার দায় উভয় সরকারকে নিতে হবে, প্রকল্পভুক্তদের উপর থেকে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, পুলিশি হয়রানি বন্ধ করতে হবে, প্রকৃত স্বনির্ভর না হওয়া অবধি কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের কার্ড চালু রাখতে হবে, ব্যবসায়ে সাফল্যের পর দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে আসল টাকা ফেরত দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে, স্বনিযুক্তি প্রকল্প অনুযায়ী বাস্তবসম্মত মূলধন সরবরাহ করতে হবে ও কর্তৃপক্ষকে তা দেখভাল করতে হবে, সমস্ত বেকারদের চাকরি না দেওয়া পর্যন্ত বেকারভাতা দিতে হবে ইত্যাদি। অবস্থান মঞ্চে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নন্দদুলাল দাস, কৌশিক চ্যাটার্জী সহ আরও অনেকে।

মেদিনীপুরে বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলন

১২ জানুয়ারি মেদিনীপুর শহর বিদ্যুৎগ্রাহকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র নিলয়ে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মেদিনীপুর পৌরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার ভানুরতন গুইন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন প্রবীণ আইনজীবী অশ্বিনী সেন, বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির জেলা সভাপতি ও সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দাস ও মধুসূদন মান্না, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠনের রাজ্য নেতা বিরতি দে, জেলা চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি আশিস কিশোর চ্যাটার্জী, শহর ব্যবসায়ী সমিতির সহ সম্পাদক মলয় রায়, গ্রাহক সমিতির শহর সভাপতি রাজগোপাল আগরওয়ালা এবং সমিতির রাজ্য সহসম্পাদক অমল মাইতি প্রমুখ।

সম্মেলনে ভানুরতন গুইনকে সভাপতি ও তপন দাসকে সম্পাদক করে ২৭ জনের শহর কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিদ্যুৎগ্রাহকদের অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র খুলে মাসে অন্তত ২ দিন পর্ষদ দপ্তরে সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি তমলুক বিদ্যালয়ে গ্রাহক সমিতির জেলা সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

কোচবিহার

অনলাইন লটারি বন্ধ ও বেকারভাতা চালুর দাবিতে জেলা যুব সম্মেলন

বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, বেকারভাতা চালু, মদ-জুয়া-অনলাইন লটারি বন্ধের দাবিতে এ আই ডি ওয়াই ও'র ডাকে কোচবিহার জেলা যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৬ জানুয়ারি সুকান্ত মঞ্চে। তিন শতাধিক প্রতিনিধি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। জেলার প্রত্যন্ত সীমান্ত এলাকা দেওয়ানগঞ্জ, সীতাই থেকে ভোর ৬টায় রওনা দিয়ে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দিতে আসেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে শহীদবাগের মাঠে জমায়েত হয়ে অত্যন্ত সুসজ্জিত সুশৃঙ্খল মিছিল শহর পরিক্রমা করে সুকান্ত মঞ্চে পৌঁছায়। এস ইউ সি আই-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কাজল চক্রবর্তী বলেন, বেকার যুবকদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙতেই মদের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। অনলাইন লটারির নামে যে সর্বনাশা জুয়া চালু করা হয়েছে তা উদ্বেগের বিষয়। এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি আহ্বান জানান। এ আই ডি ওয়াই ও'র রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড স্বপন দেবনাথ বলেন, বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান, নয়তো ভাতার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে মানিক বর্মণকে সম্পাদক ও নাজমা খোন্দকারকে সভানেত্রী করে ২৬ জনের জেলা কমিটি এবং ৪১ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে

মানবাধিকার ও নারীর নিরাপত্তা

২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর — নারী নির্যাতন বিরোধী আন্তর্জাতিক পক্ষ। ''ইন্টারন্যাশনাল ফোর্টনাইট প্রোটেসটিং ভায়োলেন্স এগেইন্সট উইমেন'' — প্রতি বছরই পালিত হয়। এদেশে ১৫টি রাজ্যে ১৫০টি সংগঠন, যাদের মধ্যে বিস্তর সংখ্যক এনজিও আছে, এই সময়ে নানারকম প্রচার ও কর্মসূচি গ্রহণ করে। এরই মধ্যে ১০ ডিসেম্বর 'ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ডে' হিসাবে উদযাপিত হয়ে গেল। আবার, ১২ ডিসেম্বর শিশু দিবস — আন্তর্জাতিক স্তরে। একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ — নারী ও শিশু, সর্বোপরি মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার শপথ ও প্রচারাভিযানের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। নারী ও শিশু অথবা পুরুষ যাই হোক, মানুষ হিসাবে অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান প্রভৃতির অধিকার সুরক্ষিত হলে সমাজের সকল অংশই সুরক্ষিত থাকতে পারে। সাধারণভাবে মানুষের অধিকার ও কল্যাণের প্রশ্ন বাদ দিয়ে পৃথকভাবে নারী ও শিশুর অধিকার বা কল্যাণ হতে পারে না।

মানবাধিকার ঃ প্রেক্ষাপট

১৭৮৯ সালের ২৬ আগস্ট ফ্রান্সের ন্যাশনাল এসেম্বলি মানুষ ও নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। এই প্রথম মানব ইতিহাসে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কয়েকটা প্রধান অধিকার লিপিবদ্ধ করা হ'ল। (১) সম্পত্তিতে অধিকার (২) নিরাপত্তার অধিকার (৩) শোষণের বিরোধিতার অধিকার (৪) মতপ্রকাশের অধিকার (৫) সারা জীবন স্বাধীনতার অধিকার (৬) প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার। সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারায় সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ধারণা খুব স্বাভাবিকভাবেই ঐ সনদে প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৭৯১ সালে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সাথে সুচিন্তিত কিছু অধিকার — 'বিল অব রাইটস্' হিসাবে যুক্ত করা হল সংবিধানে। যুক্ত করা হল প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মপালনের, বক্তব্য প্রকাশের, মুদ্রণের, সমবেত হওয়ার, অভিযোগ প্রতিকারের দাবি করার অধিকার। দ্বিতীয় সংশোধনীতে আরও যুক্ত হল নাগরিকদের অস্ত্র রাখার ও বহন করার অধিকার এবং আত্মরক্ষার অধিকার — হতে পারে তা রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী অত্যাচারের হাত থেকেও। শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মাত্রই কমবেশি এই মূল বিষয়গুলি মানবাধিকার হিসাবে নীতিগতভাবে স্বীকার করেছে এবং কোন কোন দেশ সেগুলি সংবিধানে যুক্ত করেছে। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপসহীন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জাতীয় রাষ্ট্রগুলি ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ও অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানের অধিকারের নীতিগত স্বীকৃতি দিয়েছিল — ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ জাতিগত ভেদগুলিকে ভেঙে এবং রাষ্ট্রনীতিতে তার অস্বীকৃতির ভিত্তিতেই। আধুনিক জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠলেও ইতিহাসের গতিপথে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো ও নীতিতে বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিণত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি ও তার উপরিকাঠামো হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রে। পুঁজিবাদী বিকাশের একচেটিয়া স্তরেই এমনটা সম্ভব হয়েছে। জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আসলে শ্রমিকশ্রেণীর উপর বুর্জোয়াশ্রেণীর, সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর সংখ্যালঘিষ্ঠের একনায়কত্ব।

রাষ্ট্র মানেই শ্রেণীরাষ্ট্র — লেনিন এভাবেই রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছেন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উষালগ্নে পুঁজিবাদ যে বিপ্লবী ভূমিকা নিতে পেরেছিল — সাম্রাজ্যবাদের, অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের যুগে তার সেই বিপ্লবী ভূমিকা নেই। ফলে উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশগুলিতে স্বাধীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে যেতে পারবে না। ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার সাথে আপস করবে। অর্থনীতিতেও শিল্পবিপ্লবের বৈশিষ্ট্য — অবাধ কৃষি ও শিল্পের বিকাশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেমন এদেশে জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে বুর্জোয়ারা থাকার জন্য তা হয়ে উঠেছিল — ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই ও আপসের দ্বৈতসত্তা বিশিষ্ট, যাকে মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন 'সংস্কারবাদী বিরুদ্ধবাদী' চরিত্র। সুতরাং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কী উন্নত কী অনুন্নত দেশে শ্রেণীসংগ্রামের নিরিখেই, শ্রেণী সংগ্রামের ধারায় এবং শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারাই, আক্রান্ত ও আক্রমণকারীদের সংঘর্ষের পরিণতিতেই মানুষের অধিকার সংরক্ষণ ও বিস্তৃতি অথবা অধিকার হরণ ও সংকোচনের প্রশ্নটির চূড়ান্ত ফয়সালা হতে বাধ্য। সুতরাং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্ন বা ঘোষণাবলী অথবা নারী বা শিশুর অধিকারও কাগজে-কলমে মেনে নেওয়া এবং বাস্তব রূপায়ণের প্রশ্নটি শ্রেণী সংঘর্ষের পরিণতিতেই বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আর এটাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বিভিন্ন দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার রক্ষাকে বাদ দিয়ে মানবাধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি বা ধারণা নিতান্তই বাগাড়ম্বর মাত্র।

সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ব্যাখ্যা করার ধারায় লেনিন দুনিয়ার পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ...they form part of the sum total of 'divide the world relations', become links in the chain of operations of world finance capital. প্রকৃত সত্য হল দুনিয়ার বুকে দুটো বিশ্বযুদ্ধই ঘটে গিয়েছে 'ডিভাইড দি ওয়ার্ল্ড' করতে গিয়েই। পুঁজিবাদী বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র গ্রহণ করে। এই স্তরে পৌঁছে বাজার সংকটে জর্জরিত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নতুন দেশে নতুন সম্পদের উৎস, নতুন শ্রমশক্তিকে কব্জা করে সর্বোচ্চ মুনাফার তাগিদেই যুদ্ধ বাধায়। লেনিন দেখিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদই বর্তমান যুগে যুদ্ধের জন্ম দেয়, সাম্রাজ্যবাদ যতদিন থাকবে যুদ্ধও থাকবে ততদিন। কখনো উপরোক্ত উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যেই সাম্রাজ্যবাদ শান্তির বুলি কপচায় — শান্তি দূতের ছদ্মবেশ ধারণ করে, শান্তিবাদী ভেক তার ছলনামাত্র, সর্বদাই সে পদদলিত করে মানবাধিকার। বিনাবিচারে আটক, জেলে বন্দীদের ওপর অত্যাচার, লকআপে অত্যাচারের মতো ঘটনা আজ কী উন্নত কী অনুন্নত সব পুঁজিবাদী দেশেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। এমনকী ধর্ম, বর্ণ, প্রাদেশিকতা, জাতীয় (Nationality) মানসিকতাকে ভিত্তি করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, বিভেদ, নিপীড়ন খুঁচিয়ে তোলা হচ্ছে রাষ্ট্র ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। আমেরিকা থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ এমনকী তথাকথিত বামপন্থী শাসিত রাজ্যগুলিতেও এই প্রবণতা ও চর্চা এখন শক্তিশালী হচ্ছে।

মানবাধিকার ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ফ্যাসিবাদের সামরিক পরাজয়, উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতা ও মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার, যুদ্ধবিরোধী জঙ্গি শান্তি আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধি, সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপুল শক্তি নিয়ে অভ্যুত্থান ঘটে। এমন এক পটভূমিতে বিশ্বকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার ষড়যন্ত্র, যা চলছিল, তারও রূপান্তর ঘটে। প্রত্যক্ষভাবে পদানত করে কোন দেশকে লুণ্ঠন করার বদলে লগ্নী পুঁজির ফাঁসে আবদ্ধ করে বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক শোষণ চালানো, তার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বৈদেশিক রাজনীতির ওপর সর্বব্যাপক প্রভাব বিস্তার করার কৌশল গ্রহণ করতে সাম্রাজ্যবাদ বাধ্য হল — শান্তির ধুয়া তুলে, সাহায্য করার নামে ঋণ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল দেশগুলিকে বেঁধে ফেলতে থাকে। ফলে অনেক স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও নির্ভরশীল দেশের (dependent country) মত আচরণ করতে থাকে। বলা বাহুল্য, মার্কিন লগ্নীপুঁজিই এ ব্যাপারে সবার শীর্ষে চলে যায়। লগ্নীপুঁজির বা সাম্রাজ্যবাদের যুগের এই বৈশিষ্ট্য ও প্রক্রিয়া লেনিন দেখিয়েছেন। আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির কারণে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিশ্বকে পুঁজির ক্ষমতার অনুপাতে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার ষড়যন্ত্র মুক্ত অর্থনীতির ধ্বনির আড়ালে ডব্লুটিও'র মধ্য দিয়ে কার্যকরী করা হচ্ছে। এটাই বিশ্বায়ন। লগ্নীপুঁজির তথা সাম্রাজ্যবাদের এই বিশেষ রূপ ও চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বহুপূর্বেই লেনিন দেখান, কীভাবে দুনিয়াটা ঋণদানকারী সুদখোর দেশ ও ঋণী দেশে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই বৈশিষ্ট্য ও প্রক্রিয়া মুক্ত বাণিজ্য তথা উদার অর্থনীতির বর্তমান দুনিয়াতে অনেক প্রকট, তীব্র ও ব্যাপক হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা বাজার ভাগাভাগি করার যে উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদীদের ছিল, তা সফল হয়নি। যে সাধারণ ব্যাপক বাজার-সংকটের পরিণতিতে যুদ্ধ করা হ'ল, তার কোন সুরাহা তো হলই না, বরং পুঁজিবাদের অমোঘ নিয়মে যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় সঙ্কুচিত বাজারে প্রতিযোগিতা ও সংকট বৃদ্ধি পেল অনেকগুণ এবং সংকটও হল স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর বিশ্বপরিস্থিতিতে বিশ্বজনমতকে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি দিতে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বাধ্য হয়েছিল। কারণ, নাৎসিবাদের ইহুদি বিদ্বেষ, ৬০ লক্ষ ইহুদিকে নির্মমভাবে হত্যা, যুদ্ধবন্দীদের ওপর নিপীড়ন ও তাদের হত্যা, নারী সম্পর্কে 'রান্নাঘরে ফিরে যাও, ভাল মা হও-এর ধ্বনি তখন দুনিয়ার মানুষের স্মৃতিপটে আতঙ্ক সৃষ্টি করে রেখেছে। হিরোসিমা নাগাসাকির ওপর আণবিক বোমাবর্ষণে সভ্যতার ইতিহাসে নজিরবিহীন ধ্বংস ও মৃত্যুর ছবি জনমানসে যুদ্ধবিরোধী মানসিকতা, শান্তির প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে ন্যায়বিচার, শিক্ষা ও অন্ন বস্ত্রের অধিকার প্রভৃতির প্রতি যে দুর্বার আকৃতি সৃষ্টি করেছিল, 'লীগ অব নেশনস'-এর সমাধির ওপরে ১৯৪৫-এর সদ্য গঠিত রাষ্ট্রসংঘের সনদে তার স্বীকৃতি না দিয়ে কোন উপায় ছিলনা। অবশ্য রাষ্ট্রসংঘে সোভিয়েট ইউনিয়নের অবস্থান এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচারের তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। সুতরাং রাষ্ট্রসংঘের মূল লক্ষ্য হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করা এবং মৌলিক মানবাধিকার, মানুষের ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ও মূল্য, নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রভৃতির প্রতি আস্থা পুনর্বার উচ্চারণ করতে হল রাষ্ট্রসংঘের সনদে। সনদের প্রথম ধারাতেই দেওয়া হল জাতি লিঙ্গ ভাষা ধর্ম নিরপেক্ষভাবে মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদার বিকাশ, প্রসার, যুদ্ধ ও উপনিবেশের বদলে শান্তি ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি। মানবিক অধিকার সংক্রান্ত সংজ্ঞা ও দলিল রচনার ভার দেওয়া হল রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংসদের অন্তর্ভুক্ত সংস্থা মানবিক অধিকার রক্ষা কমিশনের ওপর। এই প্রক্রিয়াতেই ১৯৪৮-এর ১০ ডিসেম্বর ভারত সহ ৫৬টি সদস্য দেশের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গৃহীত হয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ। এরপর ১৯৬৮তে তেহেরানে ও ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় সদস্য ১৭১টি দেশ নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মেনে নেওয়া হয় সব দেশের সব মানুষের অর্জনযোগ্য সাধারণ মাপকাঠি, যাতে আছে সমস্ত মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার বিকাশ এবং স্বাধীনতার সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা নিরপেক্ষভাবে সব দেশের কর্তব্য। যদিও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির এ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতার ক্ষয় ধরেছিল। সে ক্ষয় চূড়ান্ত রূপ পেল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবলুপ্তির পরের বিশ্বপরিস্থিতিতে মুক্ত দুনিয়ার উদার অর্থনীতির তথা বিশ্বায়নের দুনিয়ায়। যাবতীয় পরিষেবাকে লাভজনক করা, অবাধ কর্মসংকোচন ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবিলোপ তারই পরিণাম। নানা কুযুক্তি এবং জাতীয় নিরাপত্তা, সন্ত্রাস বিরোধিতার ধুয়া তুলে মানবাধিকার খর্ব করার কাজ চলল দুর্বার গতিতে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি মানুষের মৌলিক দাবিগুলি ইতিমধ্যেই মিটিয়ে ফেলেছিল। ১৯৪৯ সালে সফল হল চীন বিপ্লব। সব মিলিয়ে সমাজতন্ত্রকে প্রতিরোধ করার জন্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে 'মানবিক মুখ' রক্ষার তাগিদ তৈরি হ'ল, জন্ম নিল 'উন্নয়নশীল জনকল্যাণমুখী' রাষ্ট্রের ধারণা ও ঘোষণা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে স্বাধীন পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দেশগুলির পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সংহত করতে খানিকটা শান্তিপূর্ণ বিশ্বপরিস্থিতির প্রয়োজনও ছিল। যদিও এই পর্বে দেশে দেশে গণআন্দোলন ও শ্রেণী সংগ্রামের ঝড় বইছিল — মুক্তির প্রেরণায়। কী উন্নত কী অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের হাত থেকে পুঁজিপতিশ্রেণী রক্ষা পেতে খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা সহ বিভিন্ন প্রশ্নে কিছুটা সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাধ্যই হয়েছিল। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে মানবিক অধিকার রক্ষার নীতি ও প্রয়োগের বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও ব্যাপকতার সঙ্গে শর্তাধীন। এই আন্দোলনের ধারা তাই শ্রেণী সংঘর্ষের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে, উদ্ভব হয়েছে, বিকশিত হয়েছে এবং অধঃপতিত হয়েছে। স্মরণ করতে হবে সুদূর অতীতেও মার্ক্স দেখিয়েছেন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশ বা রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ দেশে যত অধিকার ও জনস্বার্থের নাগরিক স্বাধীনতার কথাই বলুক, উপনিবেশগুলিতে তারা উলঙ্গ বর্বর রক্তলোলুপ শোষণের, নির্বিচার খুন লুণ্ঠনের কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করেছিল। ভারতের জনগণ ব্রিটিশ শাসনের দিনগুলিকে কি ভুলতে পারে? এমনকী শিল্পোন্নত দুনিয়াতেও নারী পাচার, শিশুপাচার, গণিকাবৃত্তির রমরমা ব্যবসাতেও সেই সুদূর অতীতেই তারা হাত নোংরা করেছিল।

চারের পাতায় দেখুন

মানবাধিকার ও নারীর নিরাপত্তা

তিনের পাতার পর

ব্যক্তিমালিকানার অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক ছিল। ব্যক্তিমালিকানা না থাকার দরুন ব্যক্তির অধিকার নাকি খর্ব হচ্ছিল। মানবাধিকার আন্দোলনে অনেকেই এই প্রশ্ন তুলতো। এই প্রশ্নে কমিউনিস্ট ইসতেহারে বহুপূর্বেই মার্কস-এঙ্গেলস জবাব দিয়েছেন ঃ ''আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অথচ আপনাদের সমাজে জনগণের শতকরা নব্বই জনের ব্যক্তিগত মালিকানা তো ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে। অল্প কয়েকজনের ভাগ্যে সম্পত্তির একমাত্র কারণ হ'ল ঐ দশভাগের নয়ভাগ লোকের হাতে কিছু না থাকা। ...আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের অভিযোগ এই যে আপনাদের সম্পত্তির উচ্ছেদ আমরা চাই। আমরা কমিউনিস্টরা নিশ্চয়ই এটা চাই।'' বিশ্বায়নের বর্তমান দুনিয়ায় 'লোকের হাতে কিছুই না থাকা'' আরও নগ্ন হয়ে কি প্রকাশ পাচ্ছে না? এই প্রক্রিয়া কি আরও ত্বরান্বিত হয়নি? ইসতেহারে বলা হয়েছে ঃ ''সমাজে উৎপন্ন জিনিসে দখলির অধিকার থেকে কমিউনিজম কোনও লোককে বঞ্চিত করে না। দখলির মাধ্যমে অপরের পরিশ্রমকে করায়ত্ত করার ক্ষমতাই সে কেবল হরণ করে।'' এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে, অর্থনৈতিক অধিকারকে নস্যাৎ করে কোন মানবাধিকার বাস্তব রূপ পেতে পারে না।

বিশ্বায়ন পর্ব ঃ মানবাধিকার

যাই হোক, ভিয়েনা সম্মেলনের আগে ১৯৭৯-তে কোপেনহেগেন-এ কনভেনশন হল রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূর করার অঙ্গীকার নিয়ে। ১৯৯১ সালে সেন্টার ফর উইমেন্স গ্লোবাল লিডারশিপ-এর উদ্যোগে ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর চিহ্নিত করা হয় 'নারী নির্যাতনবিরোধী পক্ষ' হিসেবে। মানুষের যাবতীয় মৌলিক অধিকার, মানুষ হিসাবে নারীর অধিকার, স্বাধীনতা, শান্তি, সার্বভৌমত্ব, ন্যায়বিচার সমস্ত প্রশ্নই আজ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায়, কী উন্নত কী অনুন্নত সর্বদেশেই, পুঁজিপতিশ্রেণীর নগ্ন আক্রমণের শিকার হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দেশে দেশে চলছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে আক্রমণ। আরও বেশি করে রাষ্ট্রসংঘ হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী। দেশে দেশে অর্জিত অধিকারগুলি একের পর এক কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সামাজিক সুরক্ষার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, নিরাপত্তার অধিকার ক্রমশ লুপ্ত হচ্ছে। জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ ভেদকে হাতিয়ার করে সৃষ্টি করা হচ্ছে বিভেদ। সীমাহীন দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অনাহার মৃত্যু, অপুষ্টি অশিক্ষা, নারী পাচার, বন্দী হত্যা, খুন, ধর্ষণ, গণিকাবৃত্তি, বেকারির ভয়াবহ বৃদ্ধি, শিশুশ্রমের বিস্ময়কর বৃদ্ধি ও প্রশ্রয়-দানে বিশ্বায়নের দুনিয়ায় মানবাধিকার প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে লঙ্ঘিত হচ্ছে। নিত্য নতুন এ বাবদে প্রতিশ্রুতি হয়ে উঠেছে নিতান্তই প্রতারণার কৌশল। রাষ্ট্রগুলি বিভাজিত ধনী-গরিবে। ঋণী ও সুদখোর রাষ্ট্রে, এরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত; আবার তারা নিজ নিজ দেশে ও আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে মারতে ঐক্যবদ্ধ। সারা দুনিয়ায় শ্রেণীসংগ্রাম হয়ে উঠেছে আরও ব্যাপক ও তীব্র। আন্তর্জাতিক পুঁজির আক্রমণ হয়ে উঠেছে নজিরবিহীনভাবে বেপরোয়া। এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের আবর্তে আলোড়িত হচ্ছে মানবাধিকার, নারী অধিকার ও শিশুর দুনিয়া। চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে মানবাধিকার-এর ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি এবং তার বাস্তব ভিত্তি।

এই মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মোট যা আয়, তার ৮৫ শতাংশ ভোগ করে মাত্র ২৩ শতাংশ মানুষ। ধনী দরিদ্রের বৈষম্য আজ কোথায় পৌঁছেছে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ''বিশ্ব জনসংখ্যার সবচেয়ে ধনী ২০ শতাংশ মানুষ সবচেয়ে দরিদ্র ২০ শতাংশ মানুষের তুলনায় বর্তমানে অন্তত ১৫০ গুণ বেশি সম্পত্তিশালী এবং গত ৩০ বছর ধরে বিশ্বজুড়ে উভয়ের অর্জিত সম্পদের মধ্যে এই পার্থক্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। আয়ের দিক থেকে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ও সর্বনিম্ন ২০ শতাংশের মধ্যে এই সামগ্রিক পার্থক্য যেখানে ১৯৬০ সালে ছিল ৩০ ঃ ১, সেখানে ১৯৯১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬০ ঃ ১, এবং ১৯৯৪ সালে তা আরও বেড়ে দাঁড়াবে ৭৮ ঃ ১।'' (মানবোন্নয়ন রিপোর্ট ১৯৯২)।

এই প্রক্রিয়াই বিশ্বায়ন। ডব্লুটিও, বিশ্বব্যাঙ্ক, আইএমএফ-এর যৌথ প্রয়াসে এই ব্যবধান বাড়ছে ঝড়ের গতিতে। এটাই উন্নয়ন। ভারতেও এই উন্নয়নের হাওয়া বইছে। এই বৈষম্য ক্রমশই যে বাড়ছে, বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাবেও তার প্রমাণ মিলবে। ১৯৯৭ সালের হিসাবে মাত্র ২ ডলার বা ৯০ টাকা দৈনিক রোজগার করতে পারে, ভারতে এমন মানুষের সংখ্যা ৮৬.২ ভাগ। সারা বিশ্বের ৬০০ কোটি মানুষের মধ্যে ২৮০ কোটি মানুষের রোজগার মোটামুটি এই। এদের ওপর নির্ভরশীল শিশু বৃদ্ধ নারী প্রভৃতি সংখ্যাটি ধরলে অবস্থা কত ভয়াবহ নিশ্চয়ই অনুমান করা যায়। বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদ ব্র্যাঙ্কো মিলানোভিক সমীক্ষা করে লিখছেন, বিশ্বের শতকরা ১ ভাগ ধনী মানুষের আয় ৫৭ ভাগ দরিদ্রতম মানুষের আয়ের সমান। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে ৩-৪ লক্ষ লোক শীতের সময়, ৩০-৪০ লক্ষ লোক গরমের সময় রাস্তায় রাত কাটাতে বাধ্য হয়, ৫ - ৬ শতাংশ বেকার। বিচারবিভাগের রেকর্ড অনুযায়ী প্রতি লক্ষ মানুষে ৮ জন খুন, ৭০ জন নারীধর্ষিতা, ২০০ জন ডাকাতির, ৫৬০০ জন চুরির শিকার হয়। (সূত্র ঃ প্রসঙ্গ মানবাধিকার, সম্পাদনা শুভেন্দু দাসগুপ্ত)

রাষ্ট্রসংঘের সংস্থা আইএলও ''গ্লোবাল এমপ্লয়মেন্ট ট্রেন্ডস ফর ইয়ুথ ২০০৪'' প্রতিবেদনে লিখছে, যুবকদের মধ্যে বেকারি ২০০৩ সালে ২০০২ সালের চেয়ে ২৬.৮ শতাংশ বেশি। 'দি ইকনমিস্ট' ১৩ নভেম্বর '০৪ সংখ্যা বেকারির ক্রমবর্ধমান যে চিত্র তুলে ধরেছে তা ভয়াবহ। স্পেনে এই হার ১০.৬ শতাংশ, জার্মানিতে ১০.৭ শতাংশ, বেলজিয়ামে ১৩.২ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫.৫ শতাংশ, ইউরোভুক্ত দেশগুলিতে ৮.৯ শতাংশ। বিগত দশ বছরে আইএলও'র মতে বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধির হার ১০.৫ শতাংশ বা ১১০ কোটি আর এই সময়ে কর্মসংস্থানের হার ০.৫ শতাংশ।

১৯৮৩-১৯৯৯ সালে বিশ্বে সর্ববৃহৎ ২০০টি বহুজাতিক সংস্থার মুনাফা বৃদ্ধির পরিমাণ ৩৬২ শতাংশ। এই সময়ে ঐ সংস্থাগুলিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার মাত্র ১৪ শতাংশ। যেমন ১৯৯৪ সালে টাটা মোটরস যখন ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৪০০ গাড়ি তৈরি করেছে শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার। ২০০৪ সালে যখন ঐ সংস্থা ৩ লক্ষ ১১ হাজার ৫০০ গাড়ি তৈরি করেছে, কর্মচারীর সংখ্যা তখন হয়েছে ২১ হাজার ৪০০ জন। (সূত্র ইন্ডিয়াজ জবলেস রিকভারী, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১২ ১১ ঃ ০৪)

মন্বন্তরের অভিশাপ সঙ্গ ছাড়েনি আজও

সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর অনাহারে মারা যায় দেড় কোটি মানুষ। মন্বন্তরের অভিশাপ সঙ্গ ছাড়েনি আজও। সীমাহীন বেকারি, অনাহারে মৃত্যু ও ক্ষুধার দেশ ভারতবর্ষ। অথচ মজুত খাদ্য প্রচুর। ১৯৯৮ সালে খাদ্যশস্য মজুত ছিল ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন। ওটা বেড়ে হল ৫ কোটি টন। আরও বেড়ে হল ৬ কোটি ২০ লক্ষ টন। এই পরিমাণ কত তা বোঝাতে গিয়ে নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন দেশ পত্রিকায় জ্যাঁ দ্রজ-এর প্রসঙ্গ এনে বলেছেন, খাদ্যশস্যের বস্তাগুলো যদি পরপর সাজানো যায় তা দশ লক্ষ কিমি লম্বা হবে। একবার চাঁদে গিয়ে আবার ফিরে আসা যাবে। তিনি বলেছেন, জ্যাঁ দ্রজ যখন লিখেছেন তখন মজুত ছিল ৫ কোটি টন। আর এর পাশেই নারী শিশু সাধারণ মানুষ অনাহারে অপুষ্টিতে মরছে। বিশ্বায়নের নিয়মে ডব্লুটিও'র যুক্তি মোতাবেক খাদ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা রেশনিং ধাপে ধাপে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ্ সার্ভের সর্বশেষ সমীক্ষা জানিয়েছে, গর্ভবতী নারীদের ৮৮ শতাংশের বয়স ১৫ বছর। ৪৪ শতাংশ ভোগে রক্তাল্পতায়। ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায় না। ২২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ পায়না বিশুদ্ধ পানীয় জল। ১৯৯৪ সালেও ৪ কোটি ৫০ লক্ষ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে। ৬৪ কোটি মানুষের স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নেই। দুনিয়ার মোট গরিবের এক-তৃতীয়াংশ ভারতবাসী (আউটলুক, ৩০-৪-৯৭, ডঃ মহবুব আল হক্) সাব-সাহারান দেশগুলির চাইতেও বেশি নিরক্ষর এদেশেই। সাব-সাহারায় অপুষ্টির পরিমাণ ২০-৪০ শতাংশ, আর ভারতে ৪০-৬০ শতাংশ। ভারতের অবস্থা প্রোটিন-এনার্জি-অপুষ্টির নিরিখে আফ্রিকার চেয়ে দ্বিগুণ খারাপ। গর্ভাবস্থায় অপুষ্টির জন্যও কম ওজনের শিশু ও হৃদরোগের এত প্রাবল্য। শ্রমিক হিসাব কাজ করতে বাধ্য হয় এক-তৃতীয়াংশ শিশু (আউটলুক ঐ)। ১৯৯৭ সালের এই অবস্থা গত ৮ বছরে আরও খারাপ হয়েছে।

শিশু শ্রমিকের ভয়াবহতা কেমন, তার নমুনা হিসাবে শুধু কর্ণাটক রাজ্যের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৯১ এর সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী সেখানে ৯.৭৬ লক্ষ শিশুশ্রমিক আছে। এর মধ্যে ৪৯ শতাংশ কন্যাশিশু, যাদের বয়স ৫-১৪ বছর। বালক-বালিকার শ্রমের সংখ্যার পারস্পরিক অনুপাত ৪.২ বালক, ৬.৫ বালিকা। শিল্পে শিশুশ্রমিক ও পূর্ণ বয়স্ক শ্রমিকের অনুপাত ২ ঃ ১ (আউটলুক, ৩০-৪-৯৭)। ১৯৯৯ সালের কর্ণাটক মানবোন্নয়ন রিপোর্টে রাইটস্ ওয়াচ-এর সমীক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, রেশম তৈরি, গুটিপোকা পালন, সুতো তৈরি করার সমগ্র প্রক্রিয়ায় ৪ লক্ষ শ্রমিকের ১ লক্ষ হল শিশু শ্রমিক।

মুক্ত অর্থনীতির চুক্তিতে রপ্তানি শুল্ক ৪০ থেকে বেড়ে ৪৫ শতাংশ হওয়ায় যে মন্দা আসে তার ফলে ''শিশু শ্রমিক নির্ভর অর্থনীতি ক্ষেত্রটিতে'' আরও কম মজুরিতে তারা খাটতে বাধ্য হয়। দৈনিক ১০-২০ টাকা, যেখানে বয়স্ক মানুষের মজুরি ৬০-৭০ টাকা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিশ্বব্যাঙ্ক ও সুইস ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সূত্রে টাকা নিয়ে এই ব্যবস্থা চালায় (ডেসপেয়ার এ্যাণ্ড হোপ, পার্বতী মেনন, ২৯-১-০১)।

শিশুপাচারের ঘটনাও ক্রমশই বাড়ছে। দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, বাঙ্গালোর প্রভৃতি শহর থেকে হারিয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার শিশু। ১৯৯৬-২০০১ এই ক'বছরে কলকাতা থেকে বার্ষিক ১৫৯৯টি শিশু হারিয়ে যায়। কলকাতা পুলিশের এটা হিসেব। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হিসেব দিয়েছে '৯৬-এর তুলনায় নিখোঁজের হার কলকাতায় ১৩৩ শতাংশ বেড়েছে। এই দেশ, এই রাজ্য শিশুদের জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। (বর্তমান, ৪-১১-০৪)।

নারী পাচারের ব্যবসা দুনিয়ায় এখন ২ কোটি ডলারের। বিশ্বশ্রম সংস্থার হিসেব ঃ ২৩ লাখ বারবণিতার ২৫ শতাংশ নাবালিকা এবং ১০ শতাংশের বয়স ১০ বছরের নীচে। ১৯৯৮ এর ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্ট হল ঃ 'নাবালিকা কেনা-বেচায় এই রাজ্য দেশের শীর্ষস্থানে থেকে ৭৭ শতাংশ, বিহার ২৯ শতাংশ, মহারাষ্ট্র ২৫ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশ ১৫ শতাংশ নারীর যোগান দেয়। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো বিশ্বশ্রম সংস্থার (১৯৯৮) রিপোর্টে — বারবণিতাবৃত্তিকে 'শ্রম' বলে স্বীকৃতি দেবার দাবি জানানো হয়েছে। ঐ রিপোর্টে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনসের তথাকথিত পণ্ডিতরা দেশভিত্তিক গবেষণা (!) করে এবং এসব অর্থনীতিতে এবং জাতীয় আয়ে বারবণিতাবৃত্তিজাত আয়ের অংশ হিসেব করে এই বৃত্তি (!)-কে 'সেক্স সেক্টর' বলে স্বীকৃতি দেবার দাবি তোলে। এই পেশার ক্রমবিস্তারকে স্বীকৃতি দিয়ে এদের শ্রমিকের অধিকার এবং এই আয়ে কর আরোপ করার প্রস্তাব আসছে। (সূত্র ঃ খারাপ মেয়ের শ্রম ঃ শাশ্বতী ঘোষ, দেশ) বঞ্চিতা এই নারীদের প্রতি সহানুভূতিকে শোষণ করে কর্পোরেট হাউসের পোষ্য রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৈতিক দল এবং এদের টাকায় পোষ্য এন জি ওগুলিও মানবাধিকারের ধুয়া তুলে এই দাবি তুলছে। এদের সেবার নামে ওষুধপত্র দিয়ে মানবাধিকার রক্ষা করছে। কিন্তু কেউই বলছে না — এই পেশার নিরসন হোক; বিকল্প পেশায় এদের নিযুক্ত করা হোক। এদের 'শ্রমের অধিকার', 'স্বেচ্ছায় বৃত্তি গ্রহণে'র পক্ষে শ্রমিকনেতা, রাজনৈতিক দল, মিডিয়া, ভাড়াটে শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা যুক্তি তুলছেন। এই স্বেচ্ছায় বৃত্তি নির্বাচনের অধিকারের প্রবক্তাদের গালে থাপ্পড় দিয়েছে এক গবেষণা। কলকাতায় সমীক্ষা চালিয়েছিলেন ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিদার ডেল। তিনি দেখিয়েছেন, ৬০ শতাংশ নারী এই পেশায় এসেছেন ঘরে নির্যাতনের হাত থেকে বাধ্য হয়ে পালিয়ে বাঁচতে, ৪০ শতাংশ এসে পড়েছেন দারিদ্র্যের জ্বালায়। মর্মান্তিক সত্য হল এই স্বেচ্ছায় বৃত্তি গ্রহণের(!) পরিণামে এবং 'ব্যক্তিগত অধিকার মতো বাঁচতে গিয়ে এদের ৬৭ শতাংশ ভুগছেন পোস্ট ট্রম্যাটিক ডিসঅর্ডারে।' (সূত্র ঃ ঐ)

দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, ভারতবর্ষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের নমুনা সমীক্ষা করে দেখা গেছে এই পেশায় আগত নারীদের জীবনের প্রেক্ষাপটে রয়েছে চোখের জলের ইতিহাস — করুণ, মর্মান্তিক। এদের ৭৩ শতাংশ নির্যাতনের অভিযোগ জানিয়েছেন, ৬২ শতাংশ তুলেছেন ধর্ষণের অভিযোগ, ৪৬ শতাংশ বলেছেন অন্তত পাঁচবার তারা ধর্ষিতা হয়েছেন। চালান হওয়া এই নারীদের ৩০-৫০ শতাংশ এইড্স আক্রান্ত। নারী কমিশনের প্রাক্তন সভানেত্রী বলেছেন যে, তিনি ২ লক্ষ এমন বৃত্তির নারীর সঙ্গে এদেশে কথা বলেছেন; তারা সকলেই মুক্তি চায়। পাঁচটি দেশের ওপর সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে ৯২ শতাংশ নারীই চায় মুক্তি। চায় বিকল্প বাঁচার পথ। (সূত্র ঐ) এই আকুতিকে মূল্য দিয়ে কোন্ সরকার, কোন্ দল, কোন্ মিডিয়া, কোন্ এন জি ও, কোন্ দেশ ধ্বনি তুলেছে? কোন্ মানবাধিকার প্রবক্তারা এ ব্যাপারে ধ্বনি তুলছে? বরং ডব্লুটিও-র পরিকল্পনায়, বিশ্বায়নের দুনিয়ায় 'যৌন পর্যটন' অত্যন্ত লাভজনক শিল্প হয়ে উঠছে। তারই জন্য প্রচার ও কুযুক্তির জালে বদলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে নৈতিক বোধ, বিচার ধারা, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা। এ নিয়ে, এইড্স রোধ নিয়ে চলছে এই হীন ষড়যন্ত্র। বৃহৎ কোম্পানিগুলির ভারতের মত দেশগুলিতে আগামী পাঁচ বছরে ৫৮ কোটি ডলারের ওষুধের ব্যবসা হবে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ২০০৭-এর মধ্যে এই সহায়তার(?) জন্য ব্যবসা হবে ২০০০ কোটি ডলার। (সূত্র বর্তমান ৩০-১১-০৪)। মহান সেবামূলক (!) লক্ষ্য 'সেফ সেক্স', নিরাপদে নরকে যাও। গণিকাবৃত্তিকে আইনসিদ্ধ এবং জাতীয় আয়ের অংশ বলে চালানোর ষড়যন্ত্রীরা এবং দেশে দেশে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনায়ক,

ছয়ের পাতায় দেখুন

ইরাক নির্বাচন

একের পাতার পর

মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র নিয়ে আসার কোনও আগ্রহ মার্কিন সরকার কখনও দেখায় নি। একদা মার্কিন সেক্রেটারি অফ্ স্টেট হেনরি কিসিঙ্গারের একটি কথার মধ্য দিয়ে এ ব্যাপারে মার্কিন নীতির আসল চেহারা প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, ''মধ্যপ্রাচ্যের তেল এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এটা শুধু আরবদের হাতে ছেড়ে রাখা যায় না।'' এই অঞ্চলের যেখানেই মার্কিন সেনা বহাল রাখা হয়েছে, তার কোথাও আমেরিকা গণতন্ত্র আনার কোন চেষ্টাই করেনি। কুয়েত, সৌদি আরব ও আরব আমিরশাহীর মত দেশগুলির জনগণ আজও রাজতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর অধীনেই রয়েছে — কোথাও স্বাধীন নির্বাচন নেই; নাগরিক স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, ইউনিয়ন করার অধিকার, অথবা নারীর অধিকার কোথাও নেই।

দখলীকৃত অবস্থায় নির্বাচন

কী পরিস্থিতিতে নির্বাচন করা হল, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১ লক্ষ ৫০ হাজারের উপর মার্কিন সেনা দেশটাকে দখল করে রেখেছে, ইরাকিদের দিকে তাক করা বন্দুক হাতে তারা রাস্তায় রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এই বিদেশী সেনারাই সমগ্র ইরাক জুড়ে নিরাপত্তার নামে নজিরবিহীন আয়োজন করেছিল — দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ সহ কারফিউ জারি করেছিল, সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, ইরাকের মধ্যে গাড়ি চলাচল ও যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত নেগ্রোপন্টের তত্ত্বাবধানে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ব্যক্তিটি ১৯৮১-৮৫ সালে হন্ডুরাসে রাষ্ট্রদূত ছিল, কন্ট্রা সন্ত্রাসবাদীদের পিছনে ও খুনে বাহিনী তৈরিতে যুক্ত ছিল। এই ব্যক্তিটি রাষ্ট্রদূত থাকাকালীনই রেগন প্রশাসনের পরিকল্পনামত, হন্ডুরাসকে ঘাঁটি করে নিকারাগুয়া, এল সালভাদর ও গুয়াতেমালার জনসাধারণের উপর সশস্ত্র হামলা চালানো হয়।

এই নেগ্রোপন্টের পূর্বসূরী পল ব্রেমারই এই নির্বাচনের নিয়মকানুন তৈরি করেছিল। নির্বাচন পরিচালনার জন্য 'হাইকমিশন ফর ইলেকশনস্' নামে যে সংস্থাকে পল ব্রেমার নিযুক্ত করেছিল, তাদের ক্ষমতা ছিল মার্কিন কর্তাদের অপছন্দের হলে যেকোন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচন থেকে বাতিল করে দেওয়ার। ইরাকের শাসনকর্তার পদ ছেড়ে যাওয়ার আগে ব্রেমার যেসব বিধিবিধান তৈরি করে রেখে যায়, কোন নির্বাচনের মধ্য দিয়েই তাকে পাল্টে দেওয়ার উপায় নেই। এইসব বিধিবিধানের অনেকগুলিই আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী। ইরাকের সম্পদ লুঠ করার ও গোটা অর্থনীতির উপর মার্কিন কর্পোরেশনগুলির নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখার লক্ষ্য নিয়েই ঐগুলি তৈরি করা হয়েছিল। ইরাকের জনগণ, প্রার্থীদের যেকোন তালিকা বেছে নিয়েই ভোট দিক না কেন, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত দখলদার সরকারই নিচ্ছে আমেরিকার বৃহৎ পুঁজিপতিদের হুকুমে।

নির্বাচন পরিচালনায় নেগ্রোপেন্টকে সাহায্য করার জন্য মার্কিন অর্থে পালিত দুটো সংস্থা কাজ করেছে — যথা, ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ইন্‌স্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (এন ডি আই) এবং ইন্টারন্যাশানাল রিপাবলিকান ইন্‌স্টিটিউট (আই আর আই)। মার্কিন বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে বাইরের দেশগুলিতে নির্বাচনে কারচুপি করার কাজে এই দুটি সংস্থারই দীর্ঘ রেকর্ড আছে। তদুপরি এরা ন্যাশানাল এনডাওমেন্ট ফর ডেমোক্র্যাসী এবং ইউ এস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশানাল ডেভেলপমেন্ট নামের দুটি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে। শেষোক্ত দু'টি সংস্থা আসলে সি আই এ'র সাথে যুক্ত, এদের সামনে রেখেই সি আই এ দেশে দেশে গোপন অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালায়। এরাই ভেনেজুয়েলায় গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হুগো শ্যাভেজ সরকারকে ফেলে দেওয়ার জন্য ব্যর্থ 'ক্যুপ' করিয়েছিল এবং গণভোটের আওয়াজ তুলিয়েছিল। ইউক্রেনের নির্বাচনে কারচুপির কাজেও এরা যুক্ত ছিল, যাতে ইউক্রেনের শাসনকর্তার পদে মার্কিন সমর্থক ব্যক্তিকে বসানো যায়।

ভিয়েতনামের জনগণের বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধের সময় সেদেশেও এ ধরনের নির্বাচনই হয়েছিল। সামরিক দখলদারির মধ্যে মার্কিন খবরদারিতেই নির্বাচন হয়েছিল। প্রকৃত স্বাধীন সরকার গঠনের কোন সুযোগই সেখানে দেওয়া হয়নি। মার্কিন তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত ভিয়েতনামের কোনও নির্বাচনই সেখানে দখলদার সরকারকে ন্যায্যতা দিতে পারেনি, প্রতিরোধ সংগ্রামের সমাপ্তিও ঘটাতে পারেনি। ইরাকের নির্বাচনও এক যুদ্ধাপরাধীর তত্ত্বাবধানে বন্দুকের মুখে করা হয়েছে এবং হাতেকলমে তা করেছে সি আই এ'র মদতপুষ্ট দুই গণতন্ত্রের ভেকধারী সংস্থা। এহেন নির্বাচনের সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক আছে বলাটাই চরম ধাপ্পাবাজি।

এই নির্বাচনের কোনও বিশ্বাসযোগ্যতাই নেই

লক্ষণীয় যে, এই নির্বাচনে কোন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল ছিল না। ভোট কীভাবে হচ্ছে, ব্যালট পেপার খাঁটি কিনা, গণনা ঠিকমত হচ্ছে কিনা, এসব জানার কোনও উপায় বাইরের কারও ছিল না। পর্যবেক্ষক বলতে সি আই এ'র দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উল্লেখিত সংস্থার লোকজনই একমাত্র উপস্থিত ছিল। এ অবস্থায় এই নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা কী হতে পারে, তা যারা নির্বাচন পরিচালনা করেছে সেই বুশ প্রশাসনের চরিত্র থেকেই বোঝা যায়। এরা গণমারণাস্ত্র নিয়ে মিথ্যা বলেছে, আল-কায়েদার সাথে ইরাকের সম্পর্ক নিয়ে মিথ্যা প্রচার করেছে। বস্তুত ইরাক সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারেই বুশ সরকার আদ্যোপান্ত মিথ্যা বলেছে।

বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করতেই এই নির্বাচন

দখলদারির বিরুদ্ধে জনমত আমেরিকায় তীব্র হচ্ছে। বহু মানুষ, এমনকী মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যরা পর্যন্ত ইরাকে দখলদারির অবসান দাবি করেছেন। এ অবস্থায় পরিস্থিতির যেন উন্নতি ঘটেছে — এমন একটা মিথ্যা বাতাবরণ তৈরি করার অভিপ্রায়েই এই নির্বাচন করা হয়েছে, যেমনটা গত ২৮ জুন ক্ষমতা হস্তান্তরের নাটকের মধ্য দিয়ে করার চেষ্টা হয়েছিল। এ হল দখলদারিকে ন্যায্য দেখাতে একটা নতুন গল্প বানানো। ইরাকে গণতন্ত্র নিয়ে আসা আমেরিকারই প্রয়োজন, মার্কিন সৈন্য না থাকলে ইরাকে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে ইত্যাদি যেসব দাবি করা হচ্ছে, তা মার্কিন জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের ঘৃণ্য প্রয়াস মাত্র। একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও অন্যান্য সাম্রাজ্যের কর্তারা বিশ্বের সমস্ত জাতিকে ঔপনিবেশিক শাসনের কবজায় রাখার সমর্থনে যে ধরনের যুক্তি করত, মার্কিন শাসকদের মুখে আজ তারই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

ইরাকের জনগণের মধ্যে অনেকেই ভোট দিয়েছে এই আশায় যে, বিদেশীদের দখল থেকে দেশকে মুক্ত করার পথ হয়তো এই ভোটের মধ্য দিয়ে প্রশস্ত হবে। ইতিপূর্বে যতবার জনমত সমীক্ষা হয়েছে প্রতিটিতেই দেখা গেছে, গরিষ্ঠ ব্যাপক ইরাকি জনগণ এখনই দেশকে দখলমুক্ত দেখতে চায়। একথা যখন তারা বুঝতে পারবে যে, বর্তমান নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দখলদারিই আরও পাকাপোক্ত করা হচ্ছে, তাদের দেশকে স্থায়ীভাবে লুঠবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তখন তা ইরাকিদের ক্রোধের আগুনকে আরও তীব্র করবে এবং প্রতিরোধ সংগ্রামও উচ্চতর স্তরে যাবে।

ব্যাপক ভোট পড়ার গল্প

সংবাদমাধ্যমগুলি যতই দাবি করুক যে, বিপুল সংখ্যায় মানুষ ভোট দিয়েছে, বাস্তবে বহু অঞ্চলেই ভোট কেন্দ্রগুলি ছিল শুনশান। বিদেশে বসবাসকারী ইরাকিদের মধ্যে ৮০ শতাংশই ভোট দেয়নি। ফলে, একথা সত্য নয় যে, নিরাপত্তার অভাবের কারণে ভোটার সংখ্যা কম হয়েছে। আসলে কম সংখ্যায় মানুষ ভোট দিয়েছে। কারণ জনগণ দখলদারী শাসনের বিরোধী এবং তারা বুঝতে পেরেছে যে, এই নির্বাচন হচ্ছে দখলী শাসকদের নিজেদের দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করার একটা কৌশল। ইরাকের সর্বত্র ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ সংগ্রামই বুঝিয়ে দেয়, ইরাকের জনগণ দখলদারদের কী চোখে দেখে। দখলদাররা ইরাকে গণতন্ত্র আনার জন্য যায়নি। দখল ও লুঠ করাই তাদের লক্ষ্য, তাই গণতন্ত্রের বদলে তারা এনেছে মৃত্যু, ধ্বংস ও নিপীড়ন। ইরাকের সঙ্গে বিশ্বের জনগণও অবিলম্বে এই ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান চায়। (তথ্যসূত্র ঃ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টার, নিউইয়র্ক)

বাংলাদেশে রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিকদের আন্দোলন

বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোট সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সড়কে রিক্সা উচ্ছেদের প্রতিবাদে রিক্সা-ভ্যান শ্রমিক ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে গত ২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় রাজধানী ঢাকার মুক্তাঙ্গনে রিক্সা-ভ্যান শ্রমিকরা জমায়েত হয় এবং মিছিল সহকারে নগর ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। ভিআইপি রোডের নামে, যানজট নিরসনের মিথ্যা অজুহাতে, বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শে লুটেরা ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে চারদলীয় জোট সরকার কর্তৃক ঢাকা

শহরের বিভিন্ন সড়কে রিক্সা চলাচল বন্ধের প্রতিবাদে এই অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। অবস্থান চলাকালে বক্তৃতায় নেতৃবৃন্দ বলেন, বন্যা, খরা, নদী ভাঙন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও লুটেরা ধনিকশ্রেণীর নির্মম শোষণের শিকার হয়ে গ্রাম থেকে মানুষ ভাসতে ভাসতে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে এসে রিক্সা-ভ্যান চালিয়ে, হকারি করে মানবেতর ভাবে জীবনজীবিকা চালাচ্ছে। সরকার মানুষের কর্মসংস্থান করতে পারছে না অথচ স্বউদ্যোগে রিক্সা-ভ্যান চালিয়ে যারা জীবিকা চালাচ্ছে তাদেরকে বিকল্প কোন কাজ না দিয়ে শহরের বিভিন্ন ভিআইপি রোডের নামে রিক্সা চলাচল বন্ধ করছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্বব্যাঙ্ক পরামর্শ দিচ্ছে নগরীকে তিলোত্তমা করার জন্য শহর থেকে বস্তি, হকার, রিক্সা উচ্ছেদের। আর আমাদের দেশের নতজানু সরকার বিশ্বব্যাঙ্ক-সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা ও দেশীয় লুটেরা ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে সেই নীল নক্সা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ইতিপূর্বে সরকার বিভিন্ন সড়ক থেকে রিক্সা উচ্ছেদ করেছে যানজট নিরসনের কথা বলে। অথচ সেই রোডে নতুন কোন বাস বা পরিবহন এখনও চালু হয়নি। ফলে যাত্রী সাধারণকে মারাত্মক দুর্ভোগ পোয়াতে হচ্ছে। অথচ গরিব সাধারণ মানুষ, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী যারা সিএনজি বা ট্যাক্সিক্যাবে উঠতে পারেন না তাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা। তাছাড়া এয়ারপোর্ট রোড-শাহবাগ রোডে রিক্সা চলে না। কিন্তু ঐ রোডেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজট লেগে থাকে, তার কারণ কী?

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রতিদিন গড়ে ২৫/৩০টি নতুন প্রাইভেট গাড়ি শহরে নামছে কিন্তু নতুন রাস্তা তৈরি কিংবা যে রাস্তা আছে সেগুলো প্রশস্ত করা হচ্ছে না। ফলে যানজট নিরসনের কথা বলে রিক্সা উচ্ছেদ করা হলেও যানজট নিরসন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া বিভিন্ন রাস্তায় নির্মাণ সামগ্রী রেখে বহুতল ভবন নির্মাণকারীরা যানজট বৃদ্ধি করছে।

নেতৃবৃন্দ, যানজট নিরসনের অজুহাতে ভিআইপি রোডের নামে রিক্সা উচ্ছেদ বন্ধ করা, ভিআইপি রোড খুলে দেয়া, সারা বছর কাজ ও বন্ধ কারখানা খুলে দেয়া, পুলিশি নির্যাতন, গণগ্রেফতার বন্ধ ও প্রাইভেট গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার দাবি জানান। বিকল্প কাজ না দিয়ে আর কোন সড়কে রিক্সা চলাচল বন্ধ করলে দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন।

মুক্তাঙ্গনের সমাবেশ ও নগর ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন রিক্সা-ভ্যান শ্রমিক ঐক্য পরিষদের নেতা ও রিক্সা শ্রমিক ফ্রন্টের আহ্বায়ক নূরুল ইসলাম রঞ্জু, রিক্সা শ্রমিক সংঘের নেতা হাবিবুর রহমান, ঢাকা মহানগর রিক্সা-ভ্যান চালক সমিতির নেতা রাজ্জাক মোল্লা, রিক্সা উচ্ছেদ প্রতিরোধ সংগ্রাম কমিটির নেতা মাসুদ আহম্মেদ, ঢাকা মহানগর রিক্সা-ভ্যান মজদুর ঐক্যের নেতা সামছুল আলম ও বাংলাদেশ শ্রমিক সংঘের নেতা আবুল হোসেন। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের নেতা চৌধুরী আশিকুল আলম, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের নেতা আবদুর রাজ্জাক, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের নেতা জাফর হোসেন ও শ্রমিক সংঘের নেতা সামছুল হক সায়েম।

জর্জ বুশের অভিষেক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান মহা আড়ম্বরে পালিত হয়েছে। খরচ হয়েছে ৪ কোটি মার্কিন ডলার, অর্থাৎ ১৮০ কোটি টাকা। অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল নজিরবিহীন। এই খাতে খরচ হয়েছে আরো ১ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার, অর্থাৎ টাকার অঙ্কে ৭৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

ধনী দেশ বলে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের এহেন জাঁকজমক অনেকের চোখে অস্বাভাবিক না ঠেকলেও সেদেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। আসলে বাইরের চাকচিক্য বজায় থাকলেও আমেরিকার আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি আজ চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত। উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে সেদেশে কয়েক লক্ষ মানুষ রাস্তায় রাত কাটাতে বাধ্য হন। দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৫ থেকে ৬% আজ কর্মহীন। জর্জ বুশের রিপাবলিকান পার্টির ভোটপ্রচারে অর্থ ঢালেন যে ধনকুবের মার্ক কুবান, তিনি পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, আমেরিকার অর্থনীতির হাল ক্রমশ আরো খারাপ হচ্ছে। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, এই জর্জ বুশরাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য' বলে জাহির করে থাকেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের 'জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন'-এর হাল কী দাঁড়িয়েছে, তা কেবল ভারতেই নয়, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের তীর্থভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অত্যন্ত প্রকট। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আজকের চেহারা বিগত দিনের রাজতন্ত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। সে যুগের স্বেচ্ছাচারী রাজাদের মতই জর্জ বুশরা আজ জনগণের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের জন্য চূড়ান্ত ভোগবিলাসের ব্যবস্থা পাকা করে নিয়েছেন।

বুশ সাহেব অবশ্য আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে জাঁকজমকের জন্য সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে নেওয়া একটি পয়সাও তিনি খরচ করবেন না। অনুষ্ঠানের যাবতীয় খরচ বহন করবে বৃহৎ পুঁজির মালিক শিল্পপতিরা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, জনগণের কষ্টার্জিত উপার্জনের প্রতি দেশের রাষ্ট্রপতি কতই না বিবেচনাশীল! কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই একথা স্পষ্ট হয় যে, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আড়ম্বরের জোগান দিতে শিল্পপতিরা ঢালাও অর্থব্যয় অকারণে করেনি। বিপুল অর্থ তারা লগ্নি করেছে এই হিসাব কষে যে, ভবিষ্যতে এ থেকে বিরাট অঙ্কের মুনাফা তারা ঘরে তুলবে যার মূল্য জনগণকেই দিতে হবে। সংবাদ সংস্থা 'রয়টার্স' জানিয়েছে, ''শপথ অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে অর্থ ঢালতে কোন কার্পণ্য হয়নি। কারণ বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবা সংস্থা, জ্বালানি সংস্থা, গাড়ি ব্যবসায়ী, ওষুধ ব্যবসায়ী, তামাক ব্যবসায়ী, আর যত বিত্তশালী ব্যক্তি এখন রাজনৈতিক মহলে নিজেদের প্রভাব গড়ে তুলতে ব্যস্ত।'' ভবিষ্যতের মার্কিন অর্থনীতিতে নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবেই অঢেল টাকা খরচ করতে তারা রাজী হয়েছে। যেমন, ''আর্থিক পরিষেবা সংস্থাগুলোর ভাবনা, পেনশন তহবিলের একাংশ যদি তাদের সংস্থায় লগ্নির অনুমতি মেলে, তোফা হয়। এক্সনমোবিলের মতো জ্বালানি সংস্থার আশা, 'এনার্জি বিল' পাশ করাতে ফের চেষ্টাচরিত্র করা হলে নতুন নতুন জায়গায় তেলের খোঁজ চালানো যাবে। ...অর্থদাতাদের অন্যতম 'ফোর্ড' সংস্থার মুখপাত্র বলেছেন — যাদের হাতে নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব, তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা, পরিচিত হওয়ার এটা একটা বড় সুযোগ।'' (রয়টার্স) একথাও সকলেরই জানা যে, মুনাফাবাজ শিল্পপতিদের মুনাফার ভাণ্ডার স্ফীত হয় সাধারণ মানুষকে শোষণ করেই। সুতরাং মার্কিন প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের জাঁকজমক সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে করা হয়নি ঠিকই, তবে জর্জ বুশের অনুষ্ঠানে দেদার অর্থ উৎকোচ দিয়ে মুনাফাবাজরা ভবিষ্যতে দেশের মানুষের রক্ত আরো ভালভাবে শোষণ করবার ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছে।

দ্বিতীয়বারের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে জর্জ বুশ বিশ্বজুড়ে স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বহু লম্বা-চওড়া বুলি আউড়েছেন। সারা বিশ্বের একনায়কদের হুমকি দিয়ে বুশ একথাও বলেছেন যে, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে যখনই কোন দেশে আন্দোলন হবে, আমেরিকা তখনই নাকি তার পাশে থাকবে। যদিও পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম একনায়কের মুখের এহেন উদার বাণীকে সাধারণ মার্কিন জনগণ তীব্র ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ধুয়া তুলে জর্জ বুশ যেভাবে ইরাক আক্রমণ করে চূড়ান্ত নৃশংসতায় নিরীহ ইরাকী নাগরিকদের হত্যা করেছে — সে কথা মার্কিন জনগণ ভুলে যাননি। হোয়াইট হাউসে জর্জ বুশের কনভয় যাওয়ার রাস্তায় মোতায়েন নজিরবিহীন নিরাপত্তা-ব্যবস্থাকে হেলায় উপেক্ষা করে হাজারে হাজারে সাধারণ মার্কিন বিক্ষোভকারী জমায়েত হয়ে প্রেসিডেন্টের দিকে আঙুল দেখিয়ে আওয়াজ তুলেছেন — 'জর্জ বুশ, তুমি গণহত্যাকারী। লুকিয়ে তুমি কোথায় পালাবে?'

এবারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার অভূতপূর্ব কড়াকড়ি করা হয়েছিল। জর্জ বুশ যতই বলুন 'এটা গণতন্ত্রের উৎসব, সারা দেশের লোক গণতন্ত্র আর আমার জয় পালন করছে', বাস্তবে দেশের লোকের বিক্ষুব্ধ মানসিকতা আঁচ করে আতঙ্কিত বুশ সাহেবের প্রশাসন সমগ্র অনুষ্ঠান থেকে শত হস্ত দূরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করেছে সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বিধান করতে সেদিন শুধু যে অসংখ্য পুলিশ, সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা কুকুর মোতায়েন করা হয়েছিল তাই নয়, ঝুঁকি এড়াতে এমনকী রাস্তার ম্যানহোলের ঢাকনাগুলিও ঝালাই করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল; ডাকবাক্স থেকে চিঠি তোলা বন্ধ রাখার সঙ্গে সঙ্গে ছুটি দেওয়া হয়েছিল বেশিরভাগ সরকারি কর্মচারীদের। অন্যান্য কর্মী-শ্রমিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল অনুষ্ঠানস্থলের এলাকা না মাড়াতে। এতদ্‌সত্ত্বেও রোখা যায়নি বিক্ষোভকারীদের; প্রেসিডেন্টের শোভাযাত্রার রাস্তা থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে ঘাম ছুটে গেছে পুলিশের। বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দিতে দিতে বরফের চাঁই, বোতল ছুঁড়েছে কনভয়ের দিকে; বিক্ষোভকারীদের দূরে সরাতে গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়ানো হয় তাদের উপর। এভাবেই আমেরিকার সাধারণ মানুষ প্রেসিডেন্ট বুশ ও তাঁর 'গণতন্ত্রে'র বিজয় উৎসব পালন করেছেন। মার্কিন মহারাজার দ্বিতীয় অভিষেক 'গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য' বলে কথিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের প্রকৃত চেহারাকে আবার নগ্ন করে দিল।

পুঁজিবাদ কোনদিনই প্রকৃত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না

চারের পাতার পর

অর্থনীতিবিদ, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি দুনিয়াটাকে নারী-শিশু হত্যার বধ্যভূমিতে পরিণত করেছে। মানবাধিকার কোথায়? তীব্র শ্রেণীদ্বন্দ্বের সঙ্গে মানবাধিকারের প্রশ্নটির সম্পর্ক আজ খুবই প্রকাশ্যে এসে পড়েছে।

সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় ৭.৪ কোটি নারী নিখোঁজ সরকারি হিসাবে। প্রথা বা পরম্পরার অজুহাতে এশিয়া এবং আফ্রিকার ১৩ কোটি মেয়ের যৌনাঙ্গের হানি করা হয়, কোন না কোনভাবে। প্রতি বছর এই নিপীড়নের বৃদ্ধির হার আগের বছরের তুলনায় ২০ লক্ষ বেশি। ভারতে ১৯৯৪ সালে নানা ধরনের নারী নির্যাতনের সংখ্যা ৮২,৮১৮টি ছিল। আর ১৯৯২-এ এই রাজ্যে ১৪১২টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, ১৯৯৫-এ দাঁড়ায় ৬৮৭৪-এ। (সূত্র ঃ মানবাধিকার, মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়) এই নিপীড়ন বাড়ছে। শিশুপাচার, শিশুশ্রমিক, শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়ন বাড়ছে। নারী বা শিশু বাস্তবে ব্যক্তি মানুষ হিসাবে অধিকার, নিরাপত্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার, বেঁচে থাকার জন্য অর্থনৈতিক অধিকার কতটুকু পেয়েছে? বরং মানবাধিকার সনদে ঘোষিত অর্জিত মর্যাদা, সুরক্ষা, নিরাপত্তা সবই ক্রমাগত লুঠ হয়ে যাচ্ছে।

মানবাধিকার রক্ষা ঃ আজ কী করতে হবে

কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে, বিজেপি শাসিত রাজ্যে, তথাকথিত বামশাসিত রাজ্যে অথবা জাতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস, জনতা, বাম-কংগ্রেস সমন্বয়ের বর্তমান জমানায় অথবা বিগত বিজেপি'র জমানায় — নারী শিশু তথা মানুষের মানুষ হিসাবে মৌলিক অধিকারগুলি ক্রমশই খর্ব করা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণ বিদ্বেষ, লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে নিপীড়ন ও হত্যা বাড়ছে। বাড়ছে অনাহার, বেকারি, নিরাশ্রয় মানুষের বন্যা। বাড়ছে ছিন্নমূল পরিযায়ী শ্রমিক। শান্তির বুলি কপচানো বাড়লেও দেশে দেশে স্বাধীনতা হরণ করা, যুদ্ধ চাপিয়ে অসংখ্য নারী-শিশু সাধারণ মানুষকে হত্যা করা চলছেই। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের রক্তাক্ত নজির হিসাবে আফগানিস্তান, ইরাক, প্যালেস্টাইনের কত দেশেই না মানবাধিকারের প্রতিশ্রুতি ছেঁড়া কাগজের মূল্যটুকুও হারিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজরা ও তাদের ছদ্মবেশী দোসররা দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা কেড়ে নিয়েছে। দল বা পার্টির নাম যাই হোক, দেশে দেশে রাজনীতিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব, প্রগতি-প্রতিক্রিয়া, শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী ও শাসিত শ্রমিকশ্রেণীর শিবির। মানবাধিকার আন্দোলন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি, বিচারধারা ও তাৎপর্যও বিভাজিত হয়েছে দুই শিবিরে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের হাতে, প্রতিক্রিয়ার হাতে, সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির হাতে এ হয়ে উঠেছে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে, নির্যাতিত মানুষের প্রতি ভালবাসাকে প্রতারণার দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির কৌশল। অপরদিকে যথার্থ কমিউনিস্টদের দায়িত্ব হচ্ছে — মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক মানুষকে বৃহত্তর মঞ্চে সংঘবদ্ধ করে সংগ্রামের দ্বারা ঐ কৌশলকে পরাস্ত করা, মানবাধিকার রক্ষার প্রকৃত সংগ্রামকে বিকশিত করা।

পুঁজিবাদ কোনদিনই নাগরিকদের, নারী, শিশুদের, সর্বোপরি মানুষের মানবাধিকার প্রকৃত অর্থে দিতে পারেনি। অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান, শান্তি সুরক্ষা দিতে পারেনি। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অনাহার, নারীপাচার, গণিকাবৃত্তি, শিশুশ্রমিক পুঁজিবাদকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী স্তরে আসার পর তার এই অভিশাপ, শোষণ, লুণ্ঠন, নিপীড়ন, অনাহার, ক্ষুধা, বেকারি সর্বক্ষেত্রে তীব্র হয়েছে, ব্যাপক হয়েছে আরও। একমাত্র সমাজতন্ত্রই পেরেছিল এই অভিশাপকে নির্মূল করতে, মানুষের পণ্য হিসাবে অবস্থানকে নির্মূল করতে।

সুতরাং বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসকে মেনে নিলে এটাকেও মানতে হবে যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদ করার শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক সংগ্রামের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, বরং তার সাথে সম্পর্ক রেখে, তারই পরিপূরকভাবে মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন, নারী নির্যাতনবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলাই আজ জরুরি ঐতিহাসিক কর্তব্য। আজ এই সংগ্রাম বিশ্বায়ন বিরোধী সংগ্রামেরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ না হয়ে উপায় নেই। গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবাধিকারের আন্দোলন গড়ে তুলতে গেলে আজ কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিদ্বেষ নিয়ে, ঘৃণা নিয়ে গড়া যাবে না। প্রো-কমিউনিস্ট মানসিকতাটুকু আজ আবশ্যিক শর্ত। প্রাক্ স্বাধীন যুগে, মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন যেমন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ হয়ে উঠেছিল, স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে গড়ে ওঠার আগে তা মিশেই ছিল, তেমন বর্তমান প্রেক্ষাপটে এদেশে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক করেই তাকে গড়ে না তুলে উপায় নেই। একসময় যেসব কমিউনিস্ট নামধারী দলগুলি মানবাধিকার নিয়ে সোচ্চার হত, আজ শ্রেণীসংগ্রামের গতিপথে বিশ্বায়নের দুনিয়ায় তারাও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের অর্থনীতির প্রতি দায়বদ্ধ হওয়ার কারণে শ্রেণীসংগ্রাম দূরে থাক, গণআন্দোলনের দমনকারী শক্তি হিসাবে ঐতিহাসিকভাবে অধঃপতিত হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তারাও চিহ্নিত পুঁজিবাদী দলগুলি ও তাদের সরকারের চেয়ে কম তৎপর নয়। সুতরাং এইসব শক্তির ভ্রান্ত প্রভাব থেকেও মানবাধিকার আন্দোলন, নারী আন্দোলন তথা শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে মুক্ত করতে হবে। এই সর্ত পূরণ করার ওপর উল্লিখিত আন্দোলনের সাফল্য নির্ভরশীল। এই সত্য অস্বীকার করা আত্মপ্রতারণা মাত্র। আলোচিত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সংগ্রামের পথেই একদিন সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের দুনিয়ায় মানুষ নামের পণ্যটি তার পণ্যচরিত্রকে ভেঙে পূর্ণ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা আদায়ের পথ সুগম করে তুলবে।

পূর্বমেদিনীপুর

হাসপাতালে অন্তর্বিভাগ চালুর দাবিতে গণঅবস্থান

নন্দীগ্রাম ব্লক হাসপাতালে রোগীদের পথ্য হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে এবং মহেশপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বন্ধ করে দেওয়া অন্তর্বিভাগ পুনরায় চালুর দাবিতে নন্দীগ্রাম থানা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির আহ্বানে দুই শতাধিক নারী-পুরুষ নন্দীগ্রাম বিডিও অফিসের সামনে ১৮-১৯ জানুয়ারি ৪৮ ঘণ্টা গণঅবস্থান শুরু করে। ১২ ঘণ্টা অবস্থান চলার পর বিডিও স্বাস্থ্য অধিকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে দাবিগুলি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিলে, অবস্থান তুলে নেওয়া হয়। এই গণঅবস্থানে নেতৃত্ব দেন — সংগঠনের থানা সম্পাদক নন্দ পাত্র, সুরেশ মণ্ডল, জয়দেব রায়, অশোক দাস প্রমুখ।

রিক্সা-ভ্যান-ঠেলা চালকদের আন্দোলন প্রসঙ্গে

পুঁজিবাদী শোষণের পরিণামে ভিটেমাটি হারিয়ে আজ যাঁরা রিক্সা-ভ্যান-ঠেলা চালিয়ে কোনক্রমে বেঁচে আছেন, সমাজের অন্যান্য অংশের শ্রমজীবী মানুষের মতই তাঁদের জীবনের সংকট উত্তরোত্তর তীব্র হচ্ছে। বেঁচে থাকাটাই আজ তাঁদের সামনে বিরাট সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। পুঁজিবাদী সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে কলে কারখানায় ছাঁটাইয়ের সংখ্যা যত বাড়ছে, জমিজায়গা হারিয়ে মানুষ যত সর্বস্বান্ত হচ্ছে, তত বেশি করে মানুষ এই পেশায় আসছে, ফলে এখানেও কাজ পাওয়ার সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সারাদিন অপেক্ষা করে বা খেটেখুটে কোনদিন জীবনধারণের জন্য হয়তো কিছুটা জোটে, কোনদিন হয়তো কিছুই জোটে না — এমনি অনিশ্চিত এঁদের জীবন। পেশাগত ক্ষেত্রেও এঁদের রয়েছে অনেক সমস্যা। শহরাঞ্চলে তথাকথিত উন্নয়নের অজুহাতে, সংস্কারের ধাক্কায় রিক্সা শ্রমিকদের দাঁড়ানোর জায়গার (স্ট্যান্ড) সমস্যা বাড়ছে। রিক্সা চালানোর লাইসেন্স আগে বিনা পয়সায় দেওয়া হত, বর্তমানে নানা এলাকায় নানারকম, কোথাও ১০ টাকা, এমনকী কোথাও ২০, ৫০ টাকা করে লাইসেন্স ফি বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করা হচ্ছে। লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রশাসনিক গড়িমসি রয়েছে। নানা অজুহাতেই রিক্সা-ভ্যান-ঠেলা চালকদের উপর পুলিশী হয়রানি বাড়ছে। অনেক সময় মালের বৈধ কাগজপত্র না থাকার দায়ে রিক্সা-ভ্যান বা ঠেলা পুলিশ আটকে দিচ্ছে। এদের উপর শারীরিক আক্রমণও নামিয়ে আনা হচ্ছে। যারা মালিকের রিক্সা ভাড়া নিয়ে চালান তাদের ভাড়া বা কিস্তির টাকার পরিমাণও বাড়ছে। কিছু কিছু শহরে পঞ্চায়েত এলাকায় রিক্সা ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। আবার কিছু বড় বড় শহর থেকে রিক্সা উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রও চলছে। এছাড়া সিপিএম সরকার রিক্সা-ভ্যান-ঠেলা চালকদের রোজগারে থাবা বসাতে পঞ্চায়েতী কর ধার্য করছে। ইতিমধ্যেই সিপিএমের নিরঙ্কুশ আধিপত্যাধীন পঞ্চায়েতগুলি এই ধরনের কর চাপানো শুরু করেছে। অন্যদের উপরও চাপ বাড়িয়ে চলছে কর আদায়ের জন্য।

হতদরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও রিক্সা-ভ্যান-ঠেলা চালকদের অধিকাংশেরই নাম আজও বিপিএল তালিকাভুক্ত হয়নি। অথচ বিপিএল-ভুক্ত না হলে এই গরিব মানুষরা হাসপাতালে পাবেন না ফ্রি বেড, পাবেন না ইন্দিরা আবাসের টাকা, বঞ্চিত হবেন অন্ত্যোদয় ও অন্নপূর্ণা যোজনার প্রাপ্য থেকে, পাবেন না বার্ধক্যভাতা, এছাড়াও হারাবেন ব্যক্তিগত কিছু প্রাপ্য। একদিন শ্রম না করলে যাদের হাঁড়ি উনুনে উঠে না, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিচারে তাঁরা দরিদ্র হিসাবে স্বীকৃত নন। তাই যে মানদণ্ডে রিক্সা-ভ্যান-ঠেলা চালকদের নাম বিপিএল তালিকায় ওঠেনা, তা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ জমছে, আওয়াজ উঠছে, সমস্ত রিক্সা-ভ্যান-ঠেলা চালকদের নাম বিপিএল তালিকাভুক্ত করতে হবে। এই দাবিতে এস ইউ সি আই দল আন্দোলনও শুরু করেছে। বিপিএল তালিকাভুক্তির চলতি মানদণ্ড যে বাস্তবোচিত নয় তা অনেক প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিই মনে করেন। পুরুলিয়া শহরে এস ইউ সি আই সমস্ত রিক্সা চালকদের নাম বিপিএল তালিকাভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। পুরুলিয়ার পূর্বতন জেলাশাসক অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এবং মানবিক এই দাবি মেনে নিয়ে তাঁদের বিপিএল তালিকাভুক্ত করেন। এস ইউ সি আই দৃঢ়ভাবে দাবি করে, দরিদ্র মানুষদের অ-দরিদ্ররূপে দেখানো চলবে না। প্রশ্ন উঠতে পারে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এদের দরিদ্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়না কেন? দরিদ্র হিসাবে স্বীকৃতি দিলে পাছে কিছু দায়িত্ব বহন করতে হয়, সেই কারণেই বুর্জোয়া রাষ্ট্র তাদের দরিদ্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়না। আবার যাদের নাম বিপিএল তালিকায় আছে, তারা সবাই কি উপরোক্ত প্রাপ্যগুলি পান? সেখানেও সরকারি মঞ্জুরি খুবই অপ্রতুল, আর তা নিয়েই চলে শাসকদলের স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি। সেই কারণে বিপিএল তালিকায় নাম উঠলেই সমস্যার পূর্ণ সমাধান হবে না, সেক্ষেত্রে এই খাতে সরকারি বরাদ্দ বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

রিক্সা-ভ্যান-ঠেলা চালকরা স্বনিযুক্ত শ্রমিক। অর্থাৎ কেউ তাদের এ পেশায় নিয়োজিত করেনি, তাঁরা নিজেরাই এ পেশায় এসেছেন। এঁদের কি কোন সামাজিক নিরাপত্তা আছে? পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে এঁদের জন্য কোন সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনি ব্যবস্থা নেই। সারা জীবন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে, অকাল বার্ধক্যে যখন তাঁরা কাজের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে, তখন তাঁদের কীভাবে চলবে? সেই কারণে এস ইউ সি আই-এর শ্রমিক সংগঠন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী দীর্ঘদিন ধরে অসংগঠিত এবং স্বনিযুক্ত শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের আওতাভুক্ত করার দাবি জানিয়ে আসছে। সুদীর্ঘ শ্রমিক আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকার 'অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প ১ জানুয়ারি ২০০১ থেকে চালু করতে বাধ্য হয়। প্রথম দফায় যে ১৩টি অসংগঠিত শিল্প এবং ৭টি স্বনিযুক্ত পেশার শ্রমিকদের এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা হয়, তার মধ্যে রিক্সা-ভ্যান-ঠেলা চালকরা আছেন। এই প্রকল্প অনুযায়ী "প্রত্যেক গ্রাহক শ্রমিক তাঁর নিজস্ব দেয় হিসাবে প্রতিমাসে ২০ টাকা করে জমা দেবেন এবং রাজ্য সরকার পরিপূরক দেয় হিসাবে সম পরিমাণ টাকা জমা দেবে। মোট জমার উপর সরকার ঘোষিত নির্দিষ্ট হারে বার্ষিক সুদ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হবে। প্রত্যেক কর্মচারীকে ৫৫ বছর বয়স পূর্ণ হলে সমস্ত টাকা সুদসহ ফেরৎ দেওয়া হবে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ৫৫ বছর বয়সের পূর্বে মৃত্যুর কারণে অথবা দীর্ঘকাল দেয় টাকা জমা না দেওয়ার কারণে আমানতের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে, সেসব ক্ষেত্রে তাঁদের জমা দেওয়া সমস্ত টাকা এবং সরকারের পরিপূরক দেয় সুদ সহ ফেরত দেওয়া হবে" (সূত্রঃ অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের সহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।

কিন্তু কী হাল এই ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের? রাজ্য সরকারের উদ্যোগ ও তৎপরতার অভাবে এই প্রকল্পটিরও হাল খারাপ। আর্থিক সংকটের অজুহাতে সরকার প্রভিডেন্ট ফান্ডের দেয় পরিপূরক টাকা জমা দিচ্ছে না বা টালবাহানা করছে। ফলে শ্রমিকরা প্রকল্পটির ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছে। অথচ শিল্পপতিদের অঢেল সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোন কার্পণ্য নেই। তাই একমাত্র যথার্থ শ্রমিক আন্দোলনের চাপ সৃষ্টি করতে পারলেই শ্রমিকের প্রাপ্য সুবিধাগুলি আদায় করা সম্ভব।

এস ইউ সি আই দল রিক্সা-ভ্যান শ্রমিকদের নিম্নলিখিত দাবিগুলি নিয়ে ইতিমধ্যেই আন্দোলন গড়ে তুলেছে। দাবি — (১) সমস্ত রিক্সা-ভ্যান-ঠেলা শ্রমিকদের বিপিএল তালিকাভুক্ত করতে হবে, (২) রিক্সা-ভ্যান-ঠেলা শ্রমিকদের বিনা পয়সায় চিকিৎসার জন্য হেল্‌থ কার্ড দিতে হবে। আইডেন্টিটি কার্ড দিতে হবে, (৩) পুলিশী হয়রানি বন্ধ করতে হবে, (৪) লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি করা চলবে না, পঞ্চায়েতী করের নামে করের বোঝা চাপানো চলবে না, (৫) প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রকল্প কার্যকরী করতে হবে। এই দাবিতে এলাকাভিত্তিক আন্দোলনের কমিটিগুলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের এগিয়ে আসতে হবে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণে ভি আর এস-এর দাবি তুলল সিটু

রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারীরা ভেবে দেখুন, সি আই টি ইউ নেতৃত্ব তাদের কোন্ আত্মঘাতী পথে নিয়ে যাচ্ছে। যে শ্রমিক কর্মচারীরা সরকারের বা মালিকপক্ষের ভি আর এসের নামে বাধ্যতামূলক অবসরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন, আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, আজ সি আই টি ইউ নেতৃত্ব সেই ভি আর এস প্রকল্প চালু করার দাবি জানাচ্ছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থায়। সিটুর রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী বলেছেন, অনেক আলাপ-আলোচনার পর উত্তরবঙ্গ পরিবহণ সংস্থায় ভি আর এস চালু করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছি আমরা। সংগঠন মনে করে, এই প্রকল্প চালু না হলে বাঁচানো যাবে না এই পরিবহণ সংস্থাকে (সংবাদ প্রতিদিন ১-২-০৫)। সি আই টি ইউ নেতার কণ্ঠে আজ শ্রমিকবিরোধী সুর। এই পরিবহণ সংস্থাটি রাজ্য সরকারের পরিচালিত, এখানকার প্রধান কর্মচারী সংগঠন সিপিএমেরই। এহেন পরিবহণ সংস্থাটি যদি লোকসানে ধুঁকতে থাকে তাহলে তার দায় কি সিপিএম নেতৃত্ব এবং রাজ্য সরকার অস্বীকার করতে পারে? লোকসানের দায়ভার কি শ্রমিক- কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে তাদের ছাঁটাই করা চলে?

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থায় কর্মী ছাঁটাইয়ের পেছনে সিপিএম সরকারের পাকা মাথা কাজ করছে। কর্মীসংখ্যা উদ্বৃত্ত দেখাতে সিপিএম সরকার এক অভিনব কায়দা নিয়েছে। কী কী উপায়ে কর্মী সংখ্যা উদ্বৃত্ত দেখানো হচ্ছে? প্রথমত, বিকল হওয়া খারাপ হওয়া গাড়িগুলি সারাই না করে ডিপোতে ফেলে রাখা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ব্রাঞ্চ রুটগুলোতে সরকারি বাস তুলে নিয়ে বেসরকারি ছোট বড় গাড়ির পারমিট দেওয়া হচ্ছে। মেইন রুটেও লোকাল বাসের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে সরকারি বাসগুলি বসিয়ে রেখে অল্প কিছু স্পেশাল ও সুপার বাস চালানো হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে এন বি এস টি সিতে যেখানে বাসের সংখ্যা ছিল ১০৫০, কমতে কমতে বর্তমানে তা ৩৫০ দাঁড়িয়েছে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২১-১-০৫)। ফলে অবসর নেওয়ার পরেও বাসপিছু কর্মীসংখ্যা উদ্বৃত্ত হয়ে যাচ্ছে। এদের কাজ দেওয়া যাচ্ছে না। অতএব ছাঁটাই কর, উদ্বৃত্ত কর্মীদের ভি আর এস, ই আর এস-এর মাধ্যমে ছাঁটাই কর। শ্রমিক-কর্মচারীরা যাঁরা দীর্ঘদিন সিপিএম করে এসেছেন, সেই সংগঠনই আজ শ্রমিক-কর্মচারীদের ছাঁটাইয়ের দাবি তুলছে। ছাঁটাইয়ের এই অভিনব পন্থার সৃষ্টি সিপিএমের। কংগ্রেস-বিজেপি সরাসরি শ্রমিক ছাঁটাই সহ যাবতীয় শ্রমবিরোধী নীতি কার্যকরী করে চলেছে। সিপিএম সরাসরি না করে নানা ঘোরানো পথে শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করার মধ্য দিয়ে সেই একই শ্রমিকবিরোধী নীতি নিয়ে চলছে। তারা ভাব দেখাচ্ছে, যেন শ্রমিকদের স্বার্থেই শ্রমিক ছাঁটাই করছে। শ্রমিকদের ছলনা করার ক্ষমতা, অন্যান্য বুর্জোয়া দলের চেয়ে সিপিএমের অনেক বেশি। এই ছলনার মুখোশ খুলে দিয়ে ভি আর এস-র নামে বাধ্যতামূলক অবসরের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে এস ইউ সি আই।

রাষ্ট্রীয় সংস্থা বেসরকারীকরণের পেছনে সিপিএমের অপর একটি কৌশল হল সংস্থার লোকসান দেখানো। এই লোকসান ঘটানোর জন্য অযোগ্য পরিচালন ব্যবস্থা, চুরি, দুর্নীতি, অবহেলা, কাজে ফাঁকি দেওয়া প্রভৃতিকে পরিকল্পনা মাফিক প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। লোকসান রোধের কথা বলে বারবার বাসের ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। ভাড়াও বেড়েছে, লোকসানও কমেনি। বাস্তবে লোকসান ঘটিয়ে ধীরে ধীরে সংস্থাটি তুলে দেওয়াই সরকারের উদ্দেশ্য যাতে বেসরকারি পরিবহণ সংস্থা একচেটিয়া বাজার পায়। পরিবহণ ব্যবসায় বেসরকারি মালিকরা যেখানে প্রচুর মুনাফা লুটছে সেখানে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা মুনাফা না করুক, আয়-ব্যয় সমান করে চালাতে পারছে না কেন? ক্ষমতাসীন সিপিএম সরকার এই সংস্থাটির বেসরকারীকরণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ না হলে সংস্থাটির চরম দুরবস্থা সৃষ্টি হতো না। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের আন্দোলনকারী শ্রমিকরা সিপিএমের মালিকঘেঁষা রাজনীতির মুখোশটা যদি আন্দোলনের মঞ্চ থেকে খুলে না দেন, তাহলে তাদের লড়াই সঠিক দিশা পাবে না। আবার একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, বেসরকারীকরণের নীতি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারেরই নীতি। দুই সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেই আজ শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।

বিহার

ছাত্র অপহরণের প্রতিবাদে মিছিল ও অবস্থান

বিহারের অপরাধ চিত্র আজ মারাত্মক রূপ নিয়েছে। সেখানে প্রতি পাঁচ মিনিটে একটি অপহরণ, প্রতি আধ ঘণ্টায় একটি হত্যা, প্রতি ১২ ঘণ্টায় একটি ধর্ষণ এবং দিনে ৬টি লুঠের ঘটনা ঘটছে। সকলে অবাক হয়ে ভাবছে বিহারে মানুষ বসবাস করছে কীভাবে, পুলিশ সেখানে করছে কী? বিহারে কংগ্রেস সরকারের আমলেই এই ধরনের লজ্জাজনক ঘটনা শুরু হয়েছিল। গত ১৫ বছর ধরে লালুপ্রসাদ-রাবড়িদেবী সরকারের শাসনকালেও একই ঘটনা ঘটে চলেছে। আর তাকেই সমর্থন দিচ্ছে কংগ্রেস, সিপিএম, সিপিআই। এদের সাথে সাথে লোক জনশক্তি পার্টি, সিপিআই(এমএল), বিজেপি প্রমুখ দলগুলিও রাজ্যের গদি দখলের উদগ্র লালসায় নানা ধরনের সুবিধাবাদী নির্বাচনী জোট গঠন করে চলেছে।

এই পরিস্থিতিতে স্কুল ছাত্র অপহরণের ঘটনাগুলির প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে গত ২৪ জানুয়ারি এক ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল পরিচালিত হয়। পাটনার গান্ধী ময়দানের নেতাজী মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু করে ঐ মিছিল ভগৎ সিং চকে শেষ হয়। সেখানে এক জনসভায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। ২৮ জানুয়ারি শিক্ষানীতি ও ছাত্র অপহরণের প্রতিবাদে পাটনায় অনুষ্ঠিত এক ছাত্র অবস্থান থেকে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমরেড অনিল কুমার।

রিক্সা-ভ্যান শ্রমিকদের সাধারণ সভা

জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা ব্লকের শিলবাড়িহাটে গত ১৬ জানুয়ারি ৮৫ জন রিক্সা-ভ্যান চালক এক সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে গড়ে তোলেন 'আলিপুরদুয়ার মহকুমা সংগ্রামী রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নে'র শিলবাড়িহাট শাখা। ২৫ জনকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন রিক্সা শ্রমিক যোগেশ বর্মন এবং সংগ্রামী রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা পূর্ণ মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। এস ইউ সি আই ফালাকাটা লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড তরণী রায় এবং সম্পাদক পীযূষ শর্মা শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই নবগঠিত ইউনিয়ন স্থায়ী স্ট্যান্ড, লাইসেন্স ও পরিচয়পত্র প্রদানের দাবির সাথে সাথে মালের বৈধ কাগজ না থাকার অজুহাতে রিক্সাভ্যান চালকদের অন্যায় হয়রানি বন্ধের দাবি জানিয়েছে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

ভারত সরকার মার্কিন তোষণনীতি বন্ধ কর

কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

মার্কিন অধিকৃত ইরাকে হাসপাতাল নির্মাণ, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং এই ধরনের অন্যান্য পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সন্তুষ্ট করার ভারত সরকারের সুপরিকল্পিত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী গত ৭ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতি দিয়েছেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে তুষ্ট করতে এবং ইরাকে বেআইনি দখলকে স্থায়ী করার মার্কিন স্বার্থ পূরণ করতে ভারত সরকার অনেকদিন ধরেই বেশ কিছু কার্যক্রম নেওয়ার চেষ্টা করে আসছিল। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত জনগণের প্রবল বিরোধিতায় তা পারেনি। পুতুল সরকারের বকলমে ইরাকে নিজেদের শাসন বলবৎ রাখার জন্য মার্কিনী নির্বাচনী প্রহসন ভারত সরকারের সেই উদ্দেশ্যপূরণের সুযোগ এনে দিয়েছে।

কমরেড নীহার মুখার্জী ভারত সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, স্বাধীনতাপ্রিয় ভারতীয় জনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন সহ্য করবে না এবং সিপিআই(এম) ও সিপিআই-এর উদ্দেশে বলেছেন, তাদের সমর্থনে চলা কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর তারা যেন চাপ সৃষ্টি করে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের তোষণ করার নীতি অবিলম্বে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে।

মালিকদের বিপুল কর ছাড়

একের পাতার পর

করের হার কমালেও উৎপাদনবৃদ্ধিজনিত বাড়তি কর আদায়ের ফলে করের মোট পরিমাণ কমতে নাও পারে, কিন্তু সরকারের সম্ভাব্য আয় বৃদ্ধিটা ঘটে না। একটা কাল্পনিক হিসাবে বিষয়টা দেখা যাক। মনে করা যাক মোট জিডিপি ১০০০ টাকা। সরকার কর বাবদ পাচ্ছে ১০০ টাকা অর্থাৎ করের হার জিডিপির ১০ শতাংশ। পরবর্তী বছরে জিডিপি বেড়ে ২০০০ টাকা হল। সরকার কর কমিয়ে ৫ শতাংশ করে দিলেও সরকারের আয় ১০০ টাকাই থাকবে, সরকার বলবে আয় কমছে না। কিংবা ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬ শতাংশ করে দিলে আয় হবে ১২০ টাকা। সরকার বলতে পারে, কর কমানো সত্ত্বেও আয় বেড়েছে। কিন্তু আসল সত্যটি হল পুরানো ১০ শতাংশ হার বজায় থাকলে সরকারের আয় হতো ২০০ টাকা, যেটা হল না; অর্থাৎ করদাতারা (প্রধানত শিল্পপতিরা) লাভবান হল।

এবার কাল্পনিক থেকে বাস্তব হিসাবে আসা যাক। এদেশে তথাকথিত উদার, অর্থাৎ মালিকদের প্রতি উদার এবং জনগণের প্রতি কঠোর আর্থিক নীতি চালুর দশ বছর আগে ১৯৮০-৮১ সালে কর ছিল জিডিপি'র ১৪.৯ শতাংশ। পরবর্তী দশ বছর প্রায় এই হারই চালু ছিল। ১৯৯০-৯১ সালে কর ছিল জিডিপির ১৫ শতাংশ। (সূত্র ঃ ইন্ডিয়ান ইকনমি, মিশ্র-পুরী) এরপরই নয়া আর্থিক নীতিতে শুরু হয় ঢালাও কর কমানো। '৯৭ সালে সিপিএম সমর্থিত সংযুক্ত মোর্চা সরকার কর ছাড়ের ব্যাপারে পূর্বেকার কংগ্রেস সরকারকে টেক্কা দিয়েছিল। মোর্চা সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসাবে চিদাম্বরমের পেশ করা বাজেটকে উদারনীতির অনুকূলে 'স্বপ্নের বাজেট' আখ্যা দিয়েছিল মালিকগোষ্ঠী ও সংবাদপত্র। তথাকথিত উদারনীতির আওতায় ছাড় দেওয়া হয়েছে প্রধানত কর্পোরেট কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, উচ্চ আয়ের স্তরে আয়কর, ক্যাপিটাল গেইনস কর, ডিভিডেন্ড কর ইত্যাদিতে — যার থেকে লাভবান হয়েছে পুঁজির মালিকরা। অতীতে পরোক্ষ করে ছাড় দিলে বাজারে জিনিসের দাম কিছু কমতো, এখন সে রীতি আর নেই। প্রত্যক্ষ কর সরাসরি মালিকদের দিতে হয় বলে প্রত্যক্ষ করে ছাড় দিলে মালিকরা সরাসরি লাভবান হয়। পরোক্ষ কর দামের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ক্রেতাকে দিতে হয় বলে পরোক্ষ করে ছাড় দিলে বাজারে দাম কমার কথা। কিন্তু বর্তমানে তা আর হয়না; দাম একই রেখে কর ছাড়ের ফয়দাটা মালিকরাই নেয়। এটা এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে একবার বাজেটে অর্থমন্ত্রীই বলেছিলেন, কর ছাড়ের ফলে যদি মালিকরা দাম না কমান তো কর ছাড় প্রত্যাহার করা হবে। অবশ্য তাতেও পার্থক্য কিছু হয়নি। কারণ মালিকদের নুন-খাওয়া অর্থমন্ত্রীর দৌড় কতদূর তা মালিকরা জানে। ফলে, এখন অন্তঃশুল্কের (এক্সাইজ) মতো পরোক্ষ করে ছাড় দিলেও মালিকরাই সেটা পকেটে পোরে।

কতটা কর ছাড় দেওয়া হয়েছে

এবার দেখা যাক, কত কর ছাড় দেওয়া হয়েছে গত বছরের বাজেটে। ক্রমাগত কর কমাতে কমাতে ২০০৪ সালে করের হার এসে দাঁড়িয়েছে জিডিপির প্রায় ৯ শতাংশে। আগের ১৫ শতাংশ থেকে করের পরিমাণ প্রায় ৯ শতাংশ করার অর্থ জিডিপি'র (১৫ - ৯) প্রায় ৬ শতাংশ কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ২০০৪ সালের আর্থিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, মোট জিডিপি হল ২৫,১৬,৯০০ কোটি টাকা। যদি '৯০-৯১ সালের করের হার, অর্থাৎ প্রায় ১৫ শতাংশ কর চালু থাকত, তাহলে সরকার কর বাবদ পেত ৩,৭৭,৫৩৫ কোটি টাকা। কিন্তু বর্তমান প্রায় ৯ শতাংশ হারে সরকার কর পাবে প্রায় ২,২৬,৫২১ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৬ শতাংশ কর কমায় শুধু ২০০৪ সালেই প্রায় ১,৫১,০১৪ কোটি টাকা সম্ভাব্য আয় সরকার ছেড়ে দিয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার টিকে আছে সিপিএমের সমর্থনে, এই বিশাল কর ছাড়ের পিছনে সিপিএমের গোপন অনুমোদন যে আছেই তা বলা বাহুল্য।

সিপিএমের চালাকি

মালিকশ্রেণীকে দেওয়া কর ছাড়ে যে সিপিএমের সম্মতি নেই এমন একটা ভান করার জন্য সিপিএম সিটুর মাধ্যমে দাবি তুলেছে '৯১ সালের তুলনায় বর্তমানে যে করছাড় দেওয়া হয়েছে তার পটভূমিতে জিডিপির মাত্র দেড় শতাংশ কর বৃদ্ধি করলেই ৩০,০০০ কোটি টাকা আয় হতে পারে এবং তার সাথে প্রতিরক্ষা খাত সহ অন্যান্য খাতে ব্যয় সংকোচ করে আরও ২০,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করে মোট ৫০,০০০ কোটি টাকা জনকল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ করতে হবে। তাদের ভাবখানা এমন যেন তারা কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের মোসাহেবি করছে না, বরং জনস্বার্থে চাপ দিয়ে, ৫০,০০০ কোটি টাকা আদায় করতে চেষ্টা করছে।

সিপিএমের এই দাবির ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ (১) বৃহৎ কৃষি পুঁজিপতিদের ওপর আয়কর বসানোর দাবি এখন তারা তুলছে না। (২) কালো টাকা উদ্ধারে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার সঙ্গত দাবি তারা এখন করেনি, যদিও ন্যূনতম কর্মসূচিতে সেই প্রতিশ্রুতি লেখা হয়েছিল। (৩) নয়া আর্থিক নীতিতে গত তের বছরে কর ছাড়ের প্রকৃত হার যেখানে জিডিপির ৬ শতাংশ, সেখানে '৯১ সালকে ভিত্তি করে মাত্র ১.৫ শতাংশ কর বৃদ্ধির কথা তারা বলছে। (দ্রঃ গণশক্তি, ২.২.০৫)

সকলেই জানেন, জিডিপি'র কমবেশি ২৫ শতাংশ হল কৃষি উৎপাদন, যার মূল্য ৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ২ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকার কৃষি উৎপাদনের মালিকানা আছে ১০ শতাংশ ধনী চাষীর হাতে যাদের এক পয়সা আয়কর দিতে হয় না। এদের আয়ের ওপর আয়কর বসালে ৫০,০০০ কোটি টাকা তোলা আদৌ কঠিন নয়। কিন্তু সে দাবি কংগ্রেস-বিজেপি তো নয়ই, সিপিএমও এখন তুলছে না। কেন তুলছে না? তাহলে কি কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে কৃষিসমৃদ্ধ উত্তর ভারতে কৃষি পুঁজিপতিদের কৃপায় ভোটে কিছু সুবিধালাভই তাদের লক্ষ্য?

কেন তারা হিসাবটা কম করে দেখাচ্ছে

সিপিএমও যেহেতু দেশি-বিদেশি মালিকদের কর ছাড় দেওয়ার নয়া আর্থিক নীতির সমর্থক এবং রাজ্যের সরকারে বসে তারাও মালিকশ্রেণীকে ক্রমাগত কর ছাড় দিচ্ছে, তাই তারা নয়া আর্থিকনীতি চালু করার পরবর্তী বছর, অর্থাৎ '৯১ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে দেখাচ্ছে কর কতটা ছাড় দেওয়া হয়েছে।

ছাড়ের হার ৬ শতাংশ বলতে হলে তাদের নয়া আর্থিক নীতির আগেকার করের হারকে নজির হিসাবে স্থাপন করতে হবে এবং নয়া আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে বলতে হবে। কিন্তু যেহেতু তারা নীতিগতভাবে নয়া আর্থিক নীতি তথা মালিকশ্রেণীর কর হ্রাসের বিরুদ্ধে নয়, তাই তারা প্রাক-উদারনীতি পর্যায়কে, অর্থাৎ '৯০ সালকে দৃষ্টান্ত হিসাবে না এনে '৯১ সালকে ভিত্তি করে হিসাবটা কম করে দেখাচ্ছে। এর দ্বারা তারা মালিকদের দেওয়া কর ছাড়ের প্রকৃত পরিমাণটা জনগণের কাছ থেকে আড়াল করছে না কি?

ক্যাপিটেশন ফি চালু করার বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও'র বিক্ষোভ

অনাবাসী কোটায় ৯ লক্ষ টাকা 'ক্যাপিটেশন ফি'র বিনিময়ে মেডিকেলে ছাত্র ভর্তি করার পর প্রবল আন্দোলন এবং সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধ রায়ের চাপে রাজ্য সরকার চরম বেকায়দায় পড়েছে। এ থেকে বাঁচতে, ক্যাপিটেশন ফি সংক্রান্ত মামলাটি পুনর্বিচারের জন্য সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছে। তাদের লক্ষ্য — একদিকে ম্যানেজমেন্ট কোটার সংখ্যাবৃদ্ধি করে উদ্ভূত সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া, অন্যদিকে শিক্ষায় বাণিজ্যিকীকরণের নীতি দ্রুত চালু করা। এর বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও কোর্টের আইনি লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার সাথে সাথে লাগাতার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলছে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৭ ফেব্রুয়ারি সারা রাজ্য জুড়ে 'দাবি দিবস' পালিত হয়েছে। ঐদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, আশুতোষ কলেজ, সিটি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজ্যের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ দেখান হয় এবং ক্যাপিটেশন ফি সংক্রান্ত সার্কুলারের প্রতিলিপি পোড়ান হয়। কলেজ স্ট্রিটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শতাধিক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে সার্কুলারের প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আয়সানুল হক। এ প্রসঙ্গে রাজ্য সম্পাদক কমরেড নভেন্দু পাল বলেন — রাজ্যের সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগসাজসে ক্যাপিটেশন ফি চালু করে ছাত্র সমাজের ওপর যে আক্রমণ নামিয়ে আনতে চলেছে তার বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবে।

বিড়ি ওয়ার্কার্স এ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের ডাকে

বিড়ি শ্রমিক কর্মচারীদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন

১২-১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

প্রকাশ্য সমাবেশ — ১২ ফেব্রুয়ারি, সদরঘাট

উদ্বোধক — কমরেড সুনীল মুখার্জী, সম্পাদক, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী

সভাপতি — কমরেড আব্দুস সঈদ, সহ সম্পাদক, বিড়ি ওয়ার্কার্স এ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন

বিশেষ অতিথি — কমরেড শঙ্কর সাহা,
সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ইউ টি ইউ সি-এল এস

প্রধান বক্তা — কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা,
সাধারণ সম্পাদক, বিড়ি ওয়ার্কার্স এ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net